রাজপ্রাসাদে ষড়যন্ত্র

১-২. জঘন্য আবহাওয়া, দারুণ চমক

০১. জঘন্য আবহাওয়া, দারুণ চমক

রোজকার মতো জনির আগেই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলো রিনি। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটা। রিনি পড়ে লন্ডনের নামকরা গ্রামার স্কুল হেনরিয়েটা বার্নেটে। স্কুল ছুটির পর গোল্ডার্স গ্রীন থেকে একবার বাস বদলিয়ে উডগ্রীন আসতে এক ঘন্টা লাগে। জনিদের ভ্যালেন্টাইন স্কুল অত দূরে নয়। তবু জনির ফিরতে ফিরতে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বাজবেই। নাকি ক্লাসের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন হয়েছে ও। হবে না কেন! চৌদ্দ বছর পুরো না হতেই শক্ত সমর্থ গড়নের জন্য জনিকে মনে হয় ষোল সতেরো বছরের মতো। লম্বায় ওর বাবাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এখনই পাঁচ আট, গেম টিচার বলেছেন ও আরো লম্বা হবে।

জনির দু বছরের বড় রিনি। মার মতোই ছোটখাট গড়নের সুন্দর হয়েছে দেখতে। মা অবশ্য বলেন ও নাকি মার চেয়েও বেশি সুন্দর হবে। মার বয়স আটত্রিশ হতে চললো, অথচ দেখে মনে হয় তিরিশ পুরো হয়নি। আজকাল মার সঙ্গে ও বাঙালী বা ইন্ডিয়ান কারো দোকানে গেলে প্রায়ই মাকে শুনতে হয় আপনার ছোট বোন বুঝি! দোকানের লোকদের দোষ কি, মা আর ও দুজনেই পাঁচ দুই। ওদের বাবাকে বরং বয়সের চেয়ে বেশি বড় মনে হয়। সামনের ফেব্রুয়ারিতে বাবার বয়স হবে বেয়াল্লিশ, অথচ দেখলে মনে হয় পঁয়তাল্লিশের ওপরে। হে মার্কেটের এক ডিপার্টমেন্ট শপের ম্যানেজার হচ্ছেন বাবা। সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরোন ফেরেন রাত নটায়। মা কাজ করেন এক কনস্ট্রাকশন ফার্মের ডিজাইন সেকশনে। অফিসে যান দশটার দিকে, ফেরেন সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ।

রিনি জনি যখন স্কুল থেকে ফেরে তখন বাবা মা কেউ বাড়িতে থাকেন না। ওদের দুজনের কাছে দুটো আলাদা চাবি আছে। যাতে কখনো জনি আগে ফিরলে ওর অসুবিধে না হয়। অবশ্য আজ পর্যন্ত চাবিটা ওর কাজে লাগে নি। কে জানে ওর কাছে ওটা আদৌ আছে কিনা!

স্কুল থেকে ফিরে সবার আগে রুটিন মতো লেটার বক্সটা খুললো রিনি। চিঠি দেখলো, বাবার নামে তিনটা, দুটো মার নামে। ওদের ভাই বোনের নামে কোনো চিঠি আসে নি। চার বছর আগে ওরা যখন প্রথম লন্ডন এলো তখন রোজই ঢাকার বন্ধুদের কারো না কারো চিঠি পেতো। কমতে কমতে এখন সপ্তায় এক আধটায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওরাও লেখা কমিয়ে দিয়েছে। জনির অবশ্য লেখার অভ্যাস

কখনোই ছিলো না। বন্ধুদের দুতিন পাতার চিঠির জবাবে একটা কার্ড পাঠিয়ে দায় সারতো। কিন্তু রিনি জনির মতো নয়। ও যত্ন করে বন্ধুদের চিঠির জবাব দিতো। তবে বন্ধুরা না লিখলে ও কি করবে! গায়ে পড়ে বন্ধুত্ব করার স্বভাব ওর নয়।

মা বাবার চিঠিগুলো ওদের শোয়ার ঘরে লেখার টেবিলে গুছিয়ে রাখলো রিনি। নিজের ঘরে এসে ব্যাগটা জায়গামতো রেখে স্কুল ড্রেস বদলালো। তারপর ও ডাইনিং রুমে এসে রিফ্রিজারেটর থেকে ফুট সালাদের বড় বাটিটা বের করলো। সকালে বেরোবার আগে মা ওদের জন্য একটা কিছু বানিয়ে রেখে যান।

একমুঠো চিজলিং আর এক বাটি সালাদ দিয়ে রাতের খাওয়া সারলো রিনি। খাওয়ার ব্যাপারে দারুণ হিসেবী ও। চার্ট দেখে ক্যালোরি হিসেব করে নিজের ডায়েট ঠিক করে নিয়েছে। সপ্তায় একদিন মাছ আর একদিন মাংশ খাবে, বাকি পাঁচদিন ফল আর সবজি। এত হিসেব করে না খেলে অমন সুন্দর ফিগার আর মাখনের মতো মোলায়েম চামড়া হতো না। জনি এ ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। ও যেভাবে চকলেট, মাখন আর পনির খায় রিনি ভয়ে শিউরে ওঠে।

খাওয়া শেষ করে প্লেট আর বাটি ধুয়ে মুছে কাবার্ডে রেখে রিনি ড্রইংরুমে এসে টেলিভিশন অন করে টুডে পত্রিকাটি হাতে নিয়ে বসলো। খবরের কাগজের পাতা ওল্টালে প্রতি দিন কত রোমাঞ্চকর ঘটনা, কত চাঞ্চল্যকর কাহিনী যে চোখে পড়ে, তার কোনো হিসেব কেউ করে নি। চ্যানেল ফোরে তখন বাংলা ছবি দেখাচ্ছে। বাংলা দেখে নড়েচড়ে বসলো রিনি। সত্যজিৎ রায়ের গণশত্রু। শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। মা শুনলে ভারি দুঃখ পাবেন।

ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখলো রিনি। মার মতো ওরও বাংলা ছবি ভালো লাগে। অথচ জনি পছন্দ করে সায়েন্স ফিকশন আর হরর মুভি। জনির পাল্লায় পড়ে দুএকটা ভয়ের ছবি দেখেছিলো রিনি। ভয়ের চেয়ে ওর অস্বস্তি লেগেছে বেশি। কি সব গা ঘিনঘিনে দৃশ্য–পেটের ভেতর থেকে নাড়িভূড়ি বেরিয়ে সাপের মতো কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষের গায়ের চামড়া ফেটে পোকা বেরোচ্ছে, চেহারা বদলে যাচ্ছে। বিভৎসভাবে–দেখাই যায় না। অথচ জনি এসব উদ্ভট ছবি আর যত আজগুবি বই গ্রোগ্রাসে গেলে।

পাঁচটা পঁচিশ মিনিটে ডোর বেল বাজলো। অস্থিরতা দেকে রিনির বুঝতে অসুবিধে হলো না–জনি এসেছে। দরজা খুলতেই হাই আপু, কখন এলি? বলে জনি ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে রোজকার মতো ওর ব্যাগটা ছুঁড়ে দিলো সোফার এক কোনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা থেকে জুতো জোড়া খসিয়ে ছুঁড়ে

দিলো ঘরের আরেক কোণে। রিনি বাইরের দরজা বন্ধ করে আসতে আসতে জনি খাবার ঘর থেকে অরেঞ্জ জুস-এর একটা প্যাকেট এনে টেলিভিশনের চ্যানেল ঘোরানো শুরু করেছে সারাক্ষণ তুই চ্যানেল ফোর নিয়ে বসে থাকিস আপু। আউটডেটেড সব ইন্ডিয়ান মুভিগুলো দেখে তুই আর আম্মু যে কি মজা পাস বুঝি না। এই দ্যাখ, চ্যানেল নাইনে ওমেন-এর ফোর্থ পার্ট দেখাবে।

নিশ্চয় হরর মুভি? নিজের জায়গায় বসতে বসতে জানতে চাইলো রিনি।

হরর তো বটেই। তুই ওমেন-এর আগের পার্টগুলো দেখিস নি? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো জনি।

না দেখি নি।

তুই কি রে আপু! হতাশ হয়ে জনি বললো, এত হইচই হচ্ছে যে ছবিটা নিয়ে তুই একটাও দেখিস নি?

তুই তো জানিস জনি, হরর মুভি দেখতে ঘেন্না লাগে আমার। আরে না। এটা এক্সরসিস্ট-এর মতো নয়। তোর খারাপ লেগেছিলো নাইটমেয়ার অন এম স্ট্রিট। এটা একেবারে অন্যরকম। একটা ছোট্ট বাচ্চাকে এভিল পাওয়ার পসেস করেছে। ভয়ানক সব কাণ্ড ঘটাচ্ছে বাচ্চা আর ওর কুকুরটা। দারুণ ছবি আপু, দ্যাখ না মজা লাগবে।

না দেখে রিনির উপায়ও নেই। জনি ওর পছন্দের ছবিই দেখবে। অথচ চ্যানেল ফোর-এ লোনলিনেস-এর ওপর সুন্দর একটা ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম হবে এখন। বললো, এসব উদ্ভট আর গাঁজাখুরি ছবিতে তুই কি মজা পাস বুঝি না জনি। দেশে থাকতে তুই এমন ছিলি না।

দেশে ছবি দেখার সময়ই বা পেতাম কখন? কত জায়গা ছিলো যাবার। অথচ এখানে লাইফ কি রকম ডাল আর বোরিং! স্কুল আর বাসা ছাড়া কোথাও যাবার জায়গা নেই। ক্রিসমাস এসে গেলো, অথচ কি একটা জঘন্য ওয়েদার। পিতপিতে বৃষ্টি হচ্ছে, ঠাণ্ডা বাতাস, নোংরা কাদামাখার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

ভয়ের ছবি দেখার উপযুক্ত পরিবেশ তাহলে এটা?

কি করবো বল! এই জঘন্য ওয়েদারে বেরোলে মনটাও খারাপ হয়ে যায়। আজ সকাল থেকে কিরকম চিন্ড বাতাস বইছে টের পাচ্ছিস না?

তারপরও তো দেরি করে ফিরলি।

দেরি কোথায় করলাম? কাল তো সাড়ে ছটায় ফিরেছি।

ইচ্ছে করলে চারটায়ও ফেরা যায়।

যায় বললেই কি যায়! আমি কি তোর মতো গুড গার্ল নাকি যে, ছুটির বেল বাজলো আর অমনি বাসে চেপে বসলাম, আর ঘরে বসে বোর হলাম!

ঠিক আছে নটি বয়। এখন তো শুধু অরেঞ্জ জুস খেলে চলবে না। কি খাবি বল?

লক্ষ্মী আপু, আমাকে দুটো বিফ বার্গার দে না টমেটো আর ক্যাবেজ দিয়ে। সঙ্গে দুটো এগ ফ্রাইও দিতে পারিস।

জ্যাকেট পোট্যাটো বাদ দিচ্ছিস কেন?

দিতে চাস? দে তাহলে। তুই যা দিবি তাই খাবো।

মদু হেসে রিনি ওর ভাইয়ের জন্য খাবার তৈরী করতে গেলো। দুবছরের এই ছোট ভাইটাই হচ্ছে ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু। কবছর আগেও বলতো, আপু, তুই আমি কেউ বিয়ে করবো না। বড় হয়ে আমরা এক সঙ্গে থাকবো। লন্ডনে আসার পর অবশ্য দুজনের আলাদা ঘর হয়েছে। ঢাকায় থাকতে ওরা এক ঘরে ঘুমোতে।

জনির খাবার তৈরি করে রিনি ড্রইংরুমে নিয়ে গেলো। ও জানে হাজার ডাকলেও ছবি দেখা থেকে উঠে ডাইনিং রুমে আসবে না জনি।

ছবি দেখতে দেখতেই ও খেলো। রিনি কিছুক্ষণ ছবি দেখে মজা না পেয়ে কসমোপলিটান পত্রিকাটা খুলে বসলো। বাইরে যে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমওয়ালা বাড়িতে বসে টের পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আটটার দিকে জনির ছবি শেষ হলো, রিনি তখন ডাক্তার নার্স নিয়ে প্রেমের গল্পটার মাঝখানে এসে পৌঁছেছে।

হরর ছবি শেষ হওয়ার পর টেলিভিশনে শুরু হলো পুরোনো দিনের এক ডকুমেন্টারি। দুর ছাই, বলে জনি একের পর এক নব ঘোরালো। পছন্দ মতো কোনো অনুষ্ঠান না পেয়ে ভিডিও গেম নিয়ে বসলো। একটা চোরকে প্রথমে তিনটা পুলিস তাড়া করে। যে খেলে তাকে চোর হতে হয়। পালাবার যত ফন্দি চোর বের করতে পারবে পয়েন্ট তত বাড়বে। প্রথম ধাপ জিতলে পরে ধাপে চারটা পুলিসের পাল্লায় পড়তে হবে চোরকে। এটা জিতলে পাঁচটা পুলিস–এভাবে পুলিসের সংখ্যা বাড়তে থাকে আর চোরেরও পালাবার পথ কমতে থাকে। জনি ছয় পুলিস পর্যন্ত খেলতে পারে। ওর ক্লাসের ছেলেরা পাঁচের ওপর যেতে পারে নি। ছয় পুলিসে ওর স্কোর এখন ছেচল্লিশ হাজার। আর চারটা ফন্দি বের করে পালাতে পারলে পঞ্চাশ হাজার পুরো হবে। এরপর পড়তে হবে সাত পুলিসের পাল্লায়।

পঁয়ত্রিশ মিনিট গভীর মনোযোগের সঙ্গে খেলে ঊনপঞ্চাশ হাজার করার পরই জনি ধরা পড়ে গেলো পুলিসের হাতে। জলতরঙ্গের শব্দের সঙ্গে স্ক্রিনে বড় বড় করে লেখা উঠলো–কনগ্রাচুলেশন, তুমি

জনির আগের রেকর্ড ভেঙে ঊনপঞ্চাশ হাজার করেছে। এটাই সর্বোচ্চ স্কোর। আবার চেষ্টা করো। খেলা শেষ।

হতাশ হয়ে গেম বন্ধ করে জনি আবার টেলিভিশনের চ্যানেল ঘোরালো। কোথাও জাজ, কোথাও আলোচনা, কোথাও রান্না শেখানো হচ্ছে। জনির পছন্দের প্রোগ্রাম একটাও নয়। বিরক্ত হয়ে বললো, আপু দুটো টাকা দে না, ছবি আনি।

দু টাকা মানে দুপাউন্ড। দেশের হিসেবে অনেক টাকা। জনিরা পাউন্ডকে টাকাই বলে। রিনি বললো, একটু আগেই বললি জঘন্য ওয়েদার। এর ভেতর দশ মিনিট তুই হাঁটবি ছবি আনার জন্য?

কি করবো বল! ছবি দেখা ছাড়া সময় কাটানোর কি আছে আমাদের। গত উইন্টারেও আম্মু আব্দুকে বললাম দেশে চলো। না, এত টাকা খরচ করা যাবে না। দুজনে মিলে টাকা জমাচ্ছে আর সামার, ক্রিসমাসের হলিডেগুলো আমাদের ঘরের মধ্যে বসে ঝিমোতে হবে।

রিনি একটু হেসে বললো, আম্বু আম্মু টাকা জমাচ্ছে তো আমাদের জন্যে। আমাদের আর বলি কেন। আমাকে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে সব তো তুইই পাবি!

তোর ভারি বিয়ের শখ দেখছি! কে তোকে বিয়ে দিতে যাচ্ছে? ওসব বিয়ে টিয়ে হবে না। এখন দুটো টাকা বের কর।

প্রতি সপ্তায় ওরা হাত খরচের জন্য বারো পাউন্ড করে পায়। জনির ওতে তিন দিনও যায় না, কিন্তু রিনির প্রায় টুরোটাই জমা থাকে। চার দিনের মাথায় অবধারিতভাবে জনি ওর কাছে ধার চাইবে। বলবে লিখে রাখতে, চাকরি করে সব শোধ করে দেবে। জনিকে টাকা ধার দিতে রিনির কোনো আপত্তি নেই, ও শুধু লক্ষ্য করে টাকাটা খরচ হচ্ছে কিভাবে।

জনি আবার তাড়া লাগালো, কি হলো আপু, টাকাটা দে না। সাড়ে আটটায় আবার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

রিনি উঠে ওর ঘরে গিয়ে দুপাউন্ডের দুটো কয়েন এনে জনিকে দিলো। বাইরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে বইছে হাড় ফুটো করা ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া। জনি রেইনকোট, গামবুট পরে বেরিয়ে পড়লো।

টেম্পারেচার যেভাবে নামছে আর কদিনের ভেতর বরফ পড়বে। মাইনাসে গেলে কাদার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, নইলে এই জঘন্য কাদা পানি মাড়িয়ে হাঁটতে গেলে গা শিউরে ওঠে।

শপিং মল-এর কাছে ইন্ডিয়ানদের এক গ্রোশারি শপ-এ সস্তায় ক্যাসেট ভাড়া পাওয়া যায়। এনে তিন চারদিন রাখাও যায়। মল-এর ভেতরে যেসব ভিডিও ক্লাব আছে সেখানে ভাড়া বেশি। জনি সব সময় ইন্ডিয়ানদের দোকান থেকে ক্যাসেট নেয়। দোকানের ভেতর ঢুকতেই হাসিখুশি শিখ যুবক বললো, বোলিয়ে বাবুজি।

নতুন কোনো হরর মুভি এসেছে? অন্য কিছুতে আগ্রহ নেই জনির।

ইধার দেখিয়ে। ইয়ে সব বিলকুল নয়া হ্যায়।

নতুন ক্যাসেটের জ্যাকেটগুলো দেখে পে সিমিট্রি আর হ্যালোয়িন থ্রি পছন্দ হলো জনির। দুপাউন্ডে দুটো ক্যাসেট নিয়ে একরকম দৌড়ে ঘরে ফিরলো জনি।

রিনি তখন রান্নাঘরে ওদের বাবা মার জন্য খাবার গরম করছিলো। মাকে অবাক করে দেয়ার জন্যও কখনো ও নতুন একটা ভাজি না হয় ভর্তা করে রাখে। রাতে ওঁরা ভাত খান। রিনির এই অবাক করা কাজ দুজনেই পছন্দ করেন। কিছুদিন আগে পূরবী আন্টির কাছে ও শিখেছিলো ডিম আর বেগুন দিয়ে চমৎকার দোপেয়াজি রান্না। অন্য কিছু না করে সেটাই বানালো রিনি। চোখে দেখলো দারুণ হয়েছে।

জনি ঘরে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাবা মাও ফিরলেন কাজ থেকে। বাবা ওঁর টুপি, ওভারকোট, ছাতা সব সিঁড়ির নিচের হ্যাঁঙ্গারে ঝোলাতে ঝোলাতে বললেন, জনি কোথায় গিয়েছিলি? পুলিস তাড়া করেছিলো নাকি!

কি যে বলো আব্দু। জনি মনক্ষুণ্ন হলো–পুলিস কেন আমাকে তাড়া করতে যাবে? ক্যাসেট আনতে গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার জন্য দৌড়ে এসেছি।

তাও ভালো। পুলিস না হোক স্কিনহেড তো তাড়া করতে পারতো।

তা পারতো। সায় জানালো জনি–তবে কাছে এসে আমার স্বাস্থ্য দেখলে গুণ্ডাগুলো কিছু করার আগে দুবার ভাবতো।

খাবার ঘর থেকে রিনি গলা তুলে ডাকলো–আব্ব, আম্মু খেতে এসো। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

বাব মার খাওয়ার সময় রিনি পাশে থাকে। জনি তখন টেলিভিশনে বিভোর। ঘরে ফিরে ও দেরি না করে পেট সিমিট্রি চালিয়ে দিয়েছে। রিনি ওর বাবাকে বললো, জনির মন ভালো নয়। এবারও শীতের বন্ধে কোথাও যেতে পারবে না।

বাবা খেতে খেতে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, যাওয়া মানে তো বাংলাদেশে। তোমাদের তো বলেছি নাইন্টি টুর আগে যাওয়া হবে না। দুটো বছর অপেক্ষা করতেই হবে।

মা বললেন, কাছাকাছি বন্ধুদের কারো ওখান থেকে ঘুরে আসুক না কদিন!

ওর সেরকম বন্ধু কোথায়? রিনি বললো, এমনিতে ক্লাসের বন্ধু যারা লন্ডনে থাকে সবাই ক্রিসমাসে ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে যাবে।

দুবছর এমন কিছু বেশি সময় নয়। চার বছর তো কেটেই গেছে। দু বছরও দেখতে দেখতে চলে যাবে। কথাটা বলার সময় রিনির বাবার খুবই খারাপ লাগছিলো। অথচ করারও কিছু ছিলো না। সবাই মিলে বাংলাদেশে যেতে হবে কম করেও ছয় সাত হাজার পাউন্ড লাগবে। খরচ তো খালি যাওয়া আসার টিকেট নয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অনেক আছে। প্রত্যেকে আশা করবে তার জন্য কি আনা হলো। এত টাকা এখন তরফদার দম্পতির হাতে নেই। বাবার অবস্থা রিনি বোঝে। এ নিয়ে আর কথা বাড়ালো না। বাবা মার খাওয়া শেষ হলে থালা বাটিগুলো ও নিজেই ধুয়ে মুছে রাখলো রোজকার মতো।

বাবাকে ড্রইংরুমে দেখে জনি খুবই অনিচ্ছার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি এখন নিউজ দেখতে চাও আব্দু?

তুমি যদি দয়া করে দেখতে দাও। মৃদু হেসে বললেন জনির বাবা।

ঠিক আছে। ছবি দেখা বন্ধ করে জনি বললো, শুধু খবর, কমেন্টস দেখা চলবে না।

ঠিক এমন সময় পাশের ঘর থেকে মা বাবাকে ডেকে বললেন, শুনেছো, ভাইয়ার চিঠি এসেছে ওয়ারস থেকে।

মনু মামা কি লিখেছে? জানতে চাইলো জনি।

রিনি জনির মামা একজনই। বছর পাঁচেক আগে পোল্যান্ড এসেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে। রিনিরা লন্ডন আসার পর থেকে প্রত্যেক সামারে ওদের চিঠি লেখেন

ওয়ারস থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য। পোল্যান্ডে গণ্ডগোলের কথা বলে ওদের বাবা রাজী হন নি।

এবার লিখেছেন, চার বছরে আমরা দুবার তোদের ওখানে বেড়াতে গেলাম, আর তোরা একবারও এলি না। রিনি জনির ভালো লাগার অনেক কিছু আছে এখানে। সারা পৃথিবী থেকে ট্যুরিস্ট আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে, অথচ তোরা আসতে চাস না। শেষবারের মতো বলছি, একবার ঘুরে যা আমি থাকতে থাকতে। জানুয়ারীর পর আমি আর এদেশে থাকছি না। এবার যদি না আসিস তাহলে এ জন্মে আর তোদের পোল্যান্ড দেখা হবে না। এখন কোনো গোলমালও নেই। নিজেদের যদি এতই অসুবিধে, ছেলেমেয়ে দুটোকে পাঠিয়ে দিলেও তো হয়। কবে আসবি জানালে বাধিত হব।

মার চিঠি পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনির চোখ দুটো উত্তেজনায় চকচক করে উঠলো বাবা কি বলেন শোনার জন্য কান খাড়া করলো। টেলিভিশনে তখনো খবর শুরু হয় নি। বাবা বললেন, রিনি জনি যদি একা যেতে পারে যাক! কাজ ফেলে আমাদের কি যাওয়া সম্ভব!

মা বললেন, আমিও ছুটি পাবো না। ভাইয়া থাকতে থাকতে ওরা বরং ঘুরে আসুক। ছ দিন পরই তো বড়দিনের ছুটি শুরু হচ্ছে।

রিনি ওর ভাইকে বললো, কি জনি, এবার খুশি তো! তখন তো ঘ্যানঘ্যান করছিলি কোথাও যাওয়া হচ্ছে না বলে।

ইয়াহু, বলে চিৎকার করে আনন্দে আত্মহারা জনি দুহাত ওপরে তুলে এক পাক নাচলো। গত বছর ও স্কুলে পোল্যান্ডের ওপর একটা ডকুমেন্টারি ছবি দেখেছিলো। বার্চ, লাইম আর ওক গাছের বনগুলো হেমন্তের শেষে রঙে রঙে আলো হয়ে যায়। বনের ভেতর গভীব নীল হ্রদ, চারদিকে পাইন আর ফার গাছে ঢাকা পর্বত-এক কথায় সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিলো জনির।

বাবা বললেন, এত যে লাফাচ্ছো, একা এতটা পথ যেতে পারবে তো?

বলো কি আব্বা! বাবার কথা শুনে অবাক হয়ে জনি বললো, ঢাকা থেকে তোমাকে ছাড়া আমরা লন্ডন আসতে পারলাম আর এই দেড় দু ঘন্টার পথ একা যেতে পারবো না?

তখন তো তোমাদের আম্মু সঙ্গে ছিলো!

আম্মুরও তো প্রথম দেশের বাইরে আসা! তাছাড়া তখন আমাদের বয়সও অনেক কম ছিলো। তবু তো মস্কো এয়ারপোর্টে দুরাত কাটিয়ে ঠিকই এসেছিলাম।

তুমি একটুও ভেবো না আব্দু।

বাবা মৃদু হেসে বললেন, আমি তাহলে কাল টিকেট করে তোমাদের মামাকে ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি কখন যাচ্ছো।

মা বললেন, এত আগে টিকেট কাটার কি দরকার?

আগে কাটলে ডিসকাউন্টের সুযোগ থাকে। জানোই তো পকেটের অবস্থা।

রিনি ওর বাবার পাশে বসেছিলো। বললো, আব্দু, আমার ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমানো আছে। তোমার দরকার হলে নিতে পারো।

বাবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার টাকা দিয়ে বরং ওদের জন্য কিছু উপহার কিনে নিয়ে যেও।

জনি বললো, আপু, আমাকে একটা জ্যাকেট কিনে দিবি? ব্লুমিংডেল-এ বিরাট সেল দিচ্ছে। পছন্দ করে এসেছি একটা।

রিনি হেসে বললো, ঠিক আছে জনি।

জনি আর রিনির জন্য গর্ব অনুভব করলেন ওদের বাবা মা। ঠিক এমনই চমৎকার দুটি সন্তান চেয়েছিলেন ওঁরা।

.

০২. আকাশপথে রহস্যময় চিত্রকর

জীবনে প্রথম ওরা বড়দের বাদ দিয়ে অন্য দেশে যাচ্ছে, এ নিয়ে রিনি জনি দুজনেই যথেষ্ট উত্তেজিত ছিলো। ছটা দিন কিভাবে যে কেটে গেলো ওরা টেরই পেলো না। ধকল অবশ্য বাবাকেই পোহাতে হয়েছে। সস্তায় যদিও বা পোলিশ এয়ার লাইন্স লট-এর টিকেট পাওয়া গেলো, ঝামেলা বেঁধেছিলো ভিসা নিয়ে। চৌদ্দ আর মোল বছরের দুটো ছেলে মেয়ে ট্যুরিস্ট হিসেবে ওয়ারস যাবে–এতে পোলিশ দূতাবাসের ভিসা অফিসার সন্তুষ্ট হতে পারছিলো না। ওয়ারস থেকে মনু মামা লন্ডনে পোলিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর ভিসা পাওয়া গেলো।

সস্তার টিকেট বলেই সরাসরি কোনো ফ্লাইটে দেয়া হয় নি। লন্ডন থেকে যেতে হবে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, তিন ঘন্টা পর সেখান থেকে ওয়ারস। ওদের ফ্লাইট ছিলো ভোর ছটায়। বাবা মা দুজনই তৈরি হয়ে ওদের সঙ্গে হিথরো এলেন। ছেলে মেয়ে দুটিকে লট-এর প্লেনে তুলে দিয়ে তারা কাজে চলে গেলেন। মা বললেন, রাতে ফোন করবেন।

জানালার কাছে সিট নিয়েছিলো ওরা। জনি বসলো একেবারে জানালা ঘেঁষে, ওর পাশে রিনি, তারপর এক হাসিখুশি সুদর্শন বুড়ো। বুড়ো হলেও রিনির মনে হলো শরীরের খুব যত্ন নেন ভদ্রলোক, বয়সটা ধরা পড়ে মাথাভরা টাকের চারপাশের পাকা চুল আর দাড়িতে। মুখে বয়সের ছাপ তেমন পড়ে নি। ওদের পাশে বসে পাঁচ মিনিট পরেই আলাপ জমালেন–ফ্রাঙ্কফুর্ট যাচ্ছো বুঝি!

রিনি সংক্ষেপে বললো, ওয়ারস।

বুড়োর মুখের হাসি আরও প্রসারিত হলো–আমিও ওয়ারস যাচ্ছি। তোমরা নিশ্চয় ভাইবোন? আমার অনুমান মিথ্যে না হলে তোমরা পাকিস্তানী, নয় ইন্ডিয়ান?

কেউ ওদের পাকিস্তানী বা ইন্ডিয়ান বললে রিনির রাগ হয়। শুকনো গলায় বললো, আমরা ভাইবোন, ঠিকই, তবে আমরা বাংলাদেশের। পাকিস্তানেরও নই, ইন্ডিয়ারও নই।

ভারি খুশি হলাম তোমাদের সহযাত্রী হিসেবে পেয়ে। আমার নাম রবার্ট মারাওস্কি। আদি বাড়ি পোল্যান্ডের ক্র্যাকভে। বর্তমানে বৃটিশ নাগরিক। গত তিরিশ বছর ধরে লন্ডনে আছি।

কেউ পরিচিত হতে চাইলে নিজেদের পরিচয় দিতে হয়, এটা রিনি জানে। বললো, আমার নাম রিনি। আমার ভাইয়ের নাম জনি। আমরা লন্ডনে পড়ি। মামার কাছে বেড়াতে যাচ্ছি।

বুড়ো মারাওস্কি বললেন, নিউইয়র্ক থেকে ছঘন্টা এলাম এক তামাকখোরের সহযাত্রী হয়ে। সারাটা পথ আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। পনেরো মিনিটে একবার করে এক্সকিউজ মি বলে আমাকে ডিঙিয়ে গেছে স্মোক করতে। একবার টপকাতে গিয়ে আমার কফির কাপ উল্টে দিয়েছে। কি উৎপাত দেখো তো! হিথরোতে নেমে ভয়ে ভয়ে ছিলাম আবার বুঝি ওই পাজীটার পাল্লায় পড়লাম। সত্যি বলছি, তোমাদের সহযাত্রী হিসেবে পেয়ে ভারি খুশি হয়েছি।

জনি একমনে বাইরে তাকিয়ে আকাশে মেঘের পাহাড়ে রোদের খেলা দেখছিলো। বুড়োকে প্রথমে ভালো না লাগলেও ওঁর অমায়িক কথায় রিনির বিরক্তি চলে গেলো। ওর ভয় ছিলো সহযাত্রী যদি কোনো পাঙ্ক বা বদমাশ টাইপের লোক হয়, তাহলে প্লেনে চড়ার সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। লন্ডনে একা রাস্তায় চলাফেরার সময় স্কিনহেড গুণ্ডা আর পাঙ্কদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে ও। অকপটেই বললো, আমি আশঙ্কা করছিলাম কোনো অসভ্য স্কিনহেডের সহযাত্রী না হতে হয় আমাকে।

খুক খুক করে একচোট হাসলেন মারাওস্কি। তারপর হাসি নামিয়ে বললেন এখন তো স্কিনহেডদের উৎপাত অনেক কমেছে। সেভেনটিয-এ ওদের জ্বালায় লন্ডন শহরে এশিয়ানদের ঘর থেকে বেরোনো মুশকিল হয়ে পড়েছিলো। তবে আফ্রিকান কালোরা সুযোগ পেলেই ওদের বেদম পিটিয়েছে।

লন্ডনে আপনি কি করেন? সহজ গলায় জানতে চাইলো রিনি।

বলতে ভুলে গেছি–আমি ছবি আঁকি। ওয়ারসতে আমারএকটা গ্যালারি আছে। আমাকে আর্ট ডিলারও বলতে পারো।

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, একজন শিল্পীর সহযাত্রী হতে পেরেছি আমরা।

মারাওস্কি কাষ্ঠ হেসে বললেন, আমাকে শিল্পী বলার জন্য ধন্যবাদ, যদিও তুমি আমার ছবি দেখো নি। তবে লন্ডনের অর্ধশিক্ষিত সমালোচকগুলো আমাকে শিল্পী বলে না, শুধু আঁকিয়ে বলে।

রিনি একটু গম্ভীর হয়ে বললো, আপনি মন খারাপ করছেন কেন? আমি অনেক বড় বড় শিল্পীর কথা পড়েছি, যারা বেঁচে থাকতে শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি পাননি।

খুশি হয়ে মারাওস্কি বললেন, তোমার সহানুভূতির জন্য অনেক ধন্যবাদ রিনি। তোমার ঠিকানা দিও আমাকে। লন্ডনে ফিরে এসে তোমাকে আমার একটা ছবি উপহার দেবো!

রিনি বিব্রত গলায় বললো, এ আপনি কি বলছেন! আমি নিশ্চয় আপনার ছবি উপহার পাওয়ার যোগ্য নই।

তোমাকে আমার ভালো লেগেছে রিনি। তোমার মতো আমার একটা মেয়ে ছিলো । আঠারো বছর আগে ও ক্যান্সারে মারা গেছে।

আমি দুঃখিত মিস্টার রবার্ট । আপনার আর কোনো ছেলে মেয়ে নেই?

না রিনি। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারাওস্কি বললেন, এ পৃথিবীতে আমি একেবারেই একা।

আমার সমবেদনা গ্রহণ করুন। আপনাকে আমি আমি আঘাত দিতে চাইনি।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বুড়ো বললেন, রিনি, আমি খুশি হবো, যদি আমাকে আঙ্কল মারাওস্কি বলো আর ফ্র্যাঙ্কফুর্টে যদি আমার সঙ্গে লাঞ্চ করো।

লাঞ্চের আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ আঙ্কল মারাওস্কি। তবে আমার মনে হয় লাঞ্চটা এয়ার লাইন্স থেকেই দেয়া হবে।

মুখ টিপে হেসে মারাওস্কি বললেন, শোনো ভালো মেয়ে। ইস্ট ইউরোপের এসব এয়ার লাইন্স থেকেই দেয়া হবে।

রিনি হেসে বললো, ঢাকা থেকে আমরা অ্যারোফ্লোটে এসেছিলাম লন্ডন। ফ্লাইটের কি গন্ডগোল হলো, পুরো দুদিন আমাদের মস্কো এয়ারপোর্টে থাকতে হয়েছিলো। খাবার যা দিয়েছিলো একেবারে অখাদ্য।

তবেই দেখ। অন্য এয়ারলাইন্স হলে তোমাদের ঠিকই ভালো কোনো হোটেলে রাখতো। ছ ঘন্টার বেশি দেরি হলে হোটেল দেয়া নিয়ম। কিন্তু এরা কোনো নিয়ম মানে না।

মনে হয় টিকেটটা সস্তায় দেয় বলেই এসব নিয়ম মানতে চায় না।

ঠিক বলেছো। সায় জানালেন মারাওস্কি। তাহলে ওই কথাই থাকলো রিনি, দুপুরে আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করবো। এই বলে তিনি জনির দিকে তাকালেন–মনে হয় তোমার ভাই খুব লাজুক। আমার সঙ্গে কোনো কথাই বললো না।

মারাওস্কির এ কথাও জনির কানে যায় নি। ও ফিরে তাকালো রিনির কনুইয়ের গুতো খেয়ে–এই জনি, ইনি হচ্ছেন আঙ্কল মারাওস্কি। আমাদের আজ দুপুরে ফ্র্যাঙ্কফুর্টে লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

জনি ব্যস্ত হয়ে হাত মিলিয়ে বললো, ধন্যবাদ আঙ্কল মারাওস্কি। তারপর চমক ভাঙতেই রিনিকে বাংলায় জিজ্ঞেস করলো, কেমন আঙ্কলরে আপু? আব্দুর বন্ধু বুঝি?

রিনি বললো, না, এখানেই আলাপ হলো। ছবি আঁকেন। খুব ভালো লোক।

ওদের বাংলা কথা শুনে মারাওস্কি চশমার ভেতর দিয়ে গোল গোল চোখে তাকালেন–তোমরা নিশ্চয় তোমাদের মাতৃভাষায় এই বুড়োটাকে গাল দিচ্ছে। আমাকে বঞ্চিত করা কি উচিৎ হচ্ছে?

জনি ব্যস্ত হয়ে বললো কক্ষনো আপনাকে আমরা গাল দেই নি। আমার বোন বলছিলো আপনি খুব ভালো লোক।

মারাওস্কি অমায়িক হেসে বললেন, আমি জানি তোমার বোন আমার সম্পর্কে খারাপ কথা বলবে না। কারণ ও নিজে খুব ভালো মেয়ে।

আর আমি? গম্ভীর হওয়ার ভান করে জানতে চাইলো জনি।

মনে হচ্ছে তুমিও ভালো ছেলে।

শুনে রাখ আপু, আমিও ভালো ছেলে!

মারাওস্কি প্রশ্ন করলেন, রিনির আরেক নাম কি আপু?

হো হো করে গলা খুলে হাসলো জনি–ওকে শুধু আমিই আপু ডাকতে পারি। আর কেউ ওকে এ নামে ডাকতে পারবে না।

আমিও তাহলে আপু ডাকবো। খুব মিষ্টি নাম আপু।

জনির সঙ্গে এবার রিনিও গলা মিলিয়ে হাসলো বললো, বড় বোনকে বাংলায় আপু নয়তো দিদি বলে আঙ্কেল মারাওস্কি। আমি আপনার আপু হতে পারি না।

তাই বলো! বোকার মতো একটু হেসে মারাওস্কি বললেন, আঙ্কেলকে বাংলায় কি বলো তোমরা?

চাচা, মামা, ফুপা, খালু-এরকম আরো আছে।

আমি তাহলে চাচা মারাওস্কি। খুব মজার শব্দ তো চাচা! জানো বোধ হয় সেকেলে একটা ইংলিশ নাচ আছে–চাচাচা বলে।

রিনি বললো, জানি। আপনার কোনটা শুনতে ভালো লাগবে, আঙ্কেল মারাওস্কি মারাওস্কি চাচা?

নিশ্চয় চাচা মারাওস্কি বলবে।

বাংলায় আমরা চাচা বলি নামের শেষে।

ঠিক আছে। নামের শেষে হলেও চলবে।

কথাটা বলেইমারওস্কি আবার খুক খুক করে হাসলেন। রিনি জনি ওঁর সঙ্গে গলা মেলালো। পাশের রোতে বসেছিলেন ইয়া মোটা এক মহিলা। সম্ভবত রাশান। কোরাসে হাসি শুনে কটমট করে তাকালেন ওদের দিকে। মারাওস্কি ভীষণ ভয় পাওয়ার ভান করে হাসি থামালেন। রিনি জনিকে ইশারা করলেন মোটা মহিলার দিকে তাকাতে ওরা মহিলাকে দেখে হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেলো।

এক ঘণ্টা পরই রিনিদের প্লেন ফ্রাঙ্কফুর্টে নামলো। এখানে প্লেন বদল করতে হবে। মারাওকি ওদের দুজনকে নিয়ে এয়ার পোর্টের ভেতরই চারদিক কাঁচে ঢাকা অভিজাত এক রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন। বাইরে দুপুরের ঝলমলে রোদ অথচ রেস্তোরাঁর ভেতর পর্দা টেনে টেবিলে মোমবাতির মতো কম আলোর ছোট ছোট টেবিল লাইট জ্বালিয়ে এক মায়াময় পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

ওরা ঢুকতেই তরুণী ওয়েট্রেস গুটেনটাখ্ বলে ওদের এক কোণের এক টেবিলে নিয়ে জার্মান ভাষায় বললো, আপনারা কি লাঞ্চ করবেন না হালকা কোনো পানীয় নেবেন?

মারাওস্কি রিনিকে বললেন, খটমটে জার্মান ভাষা বলতেও পারি না, পছন্দও করি না। ওয়েটারকে বললেন, ইংরেজি জানা কেউ আছে?

ওয়েটারের অসহায় ভাব দেখে রিনি তাড়াতাড়ি বললো, মারাওস্কি চাচা, স্কুলে আমাদের জার্মান শিখতে হয়। ওয়েট্রেস জানতে চাইছে আমরা লাঞ্চ করবো না হালকা কিছু নেবো।

দারুণ মেয়ে তো তুমি! বিস্মিত গলায় মারস্কি বললেন, ঠিক আছে, এদেশে তুমি আমার দোভাষী। ওকে লাঞ্চের কথা বলো।

রিনির কথা শুনে ওয়েট্রেস্ এক টুকরো মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে রিনির হাতে মেনু ধরিয়ে দিলেন। মেনুও জার্মান ভাষায় লেখা। রিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করে এক এক করে খাবারের নাম বললো। কয়েকটা জার্মান খাবারের অচেনা নাম দেখে ওয়েট্রেসকে জিজ্ঞেস করলো কি আছে ওতে। শেষে ওরা শার্ক ফিনের স্যুপ, কচি ভেড়ার স্টেক আর অনেক রকম সবজির গেমিউযে সালাদ নিলো। রুটি আলুর রোস্ট আর মাখন স্টেক এর সঙ্গেই দেয়া হলো।

মারাওস্কি নিজের জন্য রেড ওয়াইন নিলেন। রিনি জনি নিলো টমেটো জুস।

যদিও মারাওস্কি জনির আগ্রহ দেখে বলছিলেন, একটু রেড ওয়াইন চেখে দেখতে পারতে। রিনি শান্ত গলায় বললো, আমাদের বাবা মা বলেছেন, যাদের বয়স আঠারো হয় নি, তাদের মদ ছোঁয়া উচিৎ নয়।

তোমাদের বাবা মা কি খুব রক্ষণশীল?

আমি তা মনে করি না। বহু ভদ্র ইংরেজ পরিবারে দেখেছি আঠারো বছরের কম বয়সীরা মদ খায় না।

তোমার সততা আমাকে মুগ্ধ করেছে রিনি। বললেন মারাওস্কি।

চমৎকার লাঞ্চ সেরে লাউঞ্জে পা রাখতেই টেলিভিশনের পর্দায় ওরা দেখলো ওয়ারসগামী লট দুঘন্টা দেরিতে ছাড়বে।

মারাওস্কি বললেন, শুরু হলো ভোগান্তি। এর শেষ যে কোথায় ঈশ্বর জানেন। জনি বললো, অ্যারোফ্লোটের দুদিনের তুলনায় এমন কিছু নয়। রিনি বলল, মামার গাড়িকেও এয়ারপোর্টে দুঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

তোমাদের জন্য গাড়ি আসবে বুঝি!

হ্যাঁ। চাপা গর্বের গলায় জনি বললো, আমাদের আঙ্কল ওয়ারসতে বাংলাদেশের অ্যাম্বাসাডর।

ভালোই হলো। একগাল হেসে মারাওস্কি বললেন, শহর পর্যন্ত তোমাদের গাড়িতে লিফট নিতে পারবো।

কোথায় থাকেন তোমাদের আঙ্কল?

ঠিকানা সঙ্গে। তবে জায়গাটা কোথায় বলতে পারবো না। জবাব দিলো রিনি।

ওরা লাউঞ্জের এক কোনে বসে কথা বলছিলো। বুড়ো মারাওকি ওদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। দেড় ঘন্টা পর আবার ওরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখলো, ওয়ারস গামী লট-এর বিমানের আরো তিন ঘন্টা দেরি হবে।

এবার কিছুটা ঘাবড়ালো রিনি। মনে পড়লো মস্কোতে অ্যারোফ্লোটও একবারে বলে নি আটচল্লিশ ঘন্টা দেরির কথা। প্রত্যেকবার সময় দুতিন ঘন্টা করে বাড়িয়েছে। ওর শুকনো মুখ দেখে বুড়ো মারাওস্কি বললেন, ঘাবড়ে গেলে নাকি! আমি আছি তো!

জনি বললো, মস্কোতে দেখেছিলাম, অ্যারোফ্লোটও এভাবে দেরি করেছিলো।

তোমরা একটু বসো এখানে। আমি খবর আনছি। এই বলে মারাওস্কি ব্যস্ত পায়ে চলে গেলেন।

রিনি বললো, পাঁচ ঘন্টা দেরি মানে বুঝতে পারছিস, ওয়ারস পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।

জনি ভয় পাওয়া গলায় বললো, এয়ারপোর্টে নেমে যদি দেখি মামার গাড়ি আসে নি?

ঠিকানা আছে, ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাবো।

ট্যাক্সিওয়ালা আমাদের কোথায় নিচ্ছে বুঝবো কিভাবে? যদি টাকাপয়সা সব কেড়ে নিয়ে কোনো জঙ্গলের ভেতর নামিয়ে দেয়!

জনি, তুই এত ভীতু কেন রে? ট্যাক্সিওয়ালা থাকবে একা, আমরা দুজন। এত খাস, ব্যায়াম করিস–এভাবে ভয় পাওয়ার জন্য!

জনি কাষ্ঠ হেসে বললো, একা হলে তো সামলাতে পারবো। যদি গুণ্ডাদের ডেরায় নিয়ে যায়?

হরর ছবি দেখে দেখে ভয়টাকে তুই বাড়িয়ে দেখিস।

তুই ঠিক বললি না আপু। বিজ্ঞ গলায় জনি বললো, বিপদ আসতে পারে জানলে আমি এন্টিসিপেট করি, কি কি ঘটতে পারে। যাতে নিজে সেভাবে তৈরি থাকতে পারি।

ঠিক আছে। তোর সঙ্গে আমিও তৈরি থাকবো। হেসে বললো রিনি।

ঠিক তখনই শুকনো লিকপিকে মাঝবয়সী লম্বামুখ এক লোক সন্দেহজনকভাবে এদিক ওদিক ভালো করে দেখে রিনিদের কাছে এসে চাপা খসখসে গলায় বললো, রবার্ট মারাওস্কি তোমাদের সঙ্গে এতক্ষণ কি কথা বললো?

লোকটার কথা বলার ধরণ রিনির মোটেই পছন্দ হলো না। বললো, আপনি কি মিস্টার মারাওস্কিকে চেনেন।

খুব ভালো করেই চিনি।

চিনলে বরং তাকেই জিজ্ঞেস করবেন আমাদের সঙ্গে তিনি কি কথা বলেছেন।

রিনির এড়িয়ে যাওয়া জবাব শুনে খসখসে গলা বললো, জানো না তো ওর নামে–কথা শেষ না হতেই লোকটা হঠাৎ করে কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেলো। সম্ভবত মারাওস্কিকে আসতে দেখেছিলো ও।

লোকটা কোথায় গেলো রিনি দেখতে দিয়ে মারাওস্কির ওপর ওর নজর পড়লো। হন্তদন্ত হয়ে ওদের কাছে এসে ব্যস্ত গলায় বললেন, রিনি জনি শোন। তোমরা ঠিকই অনুমান করেছো। যে প্লেনে আমরা যাবো ওটার ইঞ্জিনে কি গন্ডগোল দেখা দিয়েছে। সারতে আরো সময় লাগতে পারে। বলকান এয়ারলাইন্সের একটা প্লেন একঘন্টা পর ওয়ারস যাচ্ছে। ওখানে কিছু সিট খালি আছে। আমি ঠিক করেছি ওটাতেই যাবো। আজ রাতে আমাকে ওয়ারস পৌঁছতেই হবে। তোমরা যেতে চাইলে ব্যবস্থা করতে পারি।

আমাদের কাছে দুবার টিকেট কাটার মতো বাড়তি টাকা নেই। শুকনো গলায় বললো রিনি।

মারাওস্কি হেসে বললেন, আরে না, টাকা লাগবে কেন। লট-এর কাউন্টারে গিয়ে দুটো কড়া ধমক দিতেই ওরা বললো, এভাবে ফ্লাইট বদলে নেয়া যায়। আরো কয়েকজন এ ফ্লাইটে যাবে। অযথা এখানে অপেক্ষা না করে আমার সঙ্গে চলো।

একটু ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেলো রিনি। এসব ব্যাপারে জনির কোনো আলাদা মত নেই। রিনি যা বলবে তাই হবে। খবর আনতে গিয়ে বুড়ো মারাওস্কি ডিউটি ফ্রি শপ থেকে একগাদা জিনিস

কিনেছেন। আগে থাকতেই ওর কাঁধে ব্যাগ ছিলো। নতুন ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। জনি সঙ্গে সঙ্গে না ধরলে ভালোরকম আছাড় খেতেন। জনি ওঁর নতুন শপিং ব্যাগটা নিজে নিলো। প্রথমে আপত্তি করে পরে একগাল হেসে অনেক ধন্যবাদ দিলেন তিনি।

একঘন্টা পর বলকান এয়ারলাইন্সের বোয়িং যখন ওয়ারসর পথে আকাশে উড়লো তখন জনির মনে হলো মারাওস্কির কথা শুনে রিনি ঠিকই করেছে। লাউঞ্জের সন্দেহজনক লোকটার কথা রিনি প্রথমে ভেবেছিলো মারাওস্কিকে বলবে না। প্লেনে ওঠার পর মনে হলো যিনি ওদের এত উপকার করছেন তাঁকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া উচিৎ। শুকনো লোকটার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মারাওস্কির চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। ভাঙা গলায় জানতে চাইলেন, নিজের নাম বলেছে লোকটা?

না, বললো আপনাকে চেনে। আপনার নামও জানে।

শেষ কথাটা আবার বলতে কি বলেছে সে?

বলেছে, জানো নাতো ওর নামে–এইটুকু বলার পর সম্ভবত আপনাকে দেখে পালিয়েছে। আপনি কি চেনেন ওকে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ কি যেন ভাবলেন মারাওস্কি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, সম্ভবত মাফিয়াদের কোনো চর হবে।

মাফিয়া কেন আপনার পেছনে লাগবে? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো জনি। মাফিয়াদের ওপর কদিন আগেই ভয়ঙ্কর একটা ছবি দেখেছে ও। মাফিয়ারা যাদের পেছনে লাগে তাদের সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকে না। ভয়ঙ্কর শক্তিশালী গুণ্ডাদের এই দলটা ইউরোপ, আমেরিকার সব বড় শহরে ছড়িয়ে রয়েছে।

জনির কথার জবাব দেয়ার আগে একটু ইতস্তত করলেন মারাওস্কি। বললেন, তোমরা ছেলেমানুষ ভেবে বলতে চাই নি । কিছুটা যখন জেনেছো তখন বলেই ফেলি। আমার মেয়ের কথা রিনিকে বলেছিলাম ক্যান্সারে মারা গেছে। হয়তো ক্যান্সারেই মারা যেতো। হাসপাতালে ক্যান্সারের জন্য ওকে ভর্তি করেছিলাম। ওর স্বাভাবিক মৃত্যুর আগে মাফিয়ারা ওকে হাসপাতালে গুলি করে হত্যা করেছে।

সে কি! চমকে উঠলো রিনি। কেন হত্যা করলো ওকে?

আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য। রুমালে চোখ মুছে নাক ঝেড়ে মারওস্কি বললেন, মাফিয়াদের একটা প্রস্তাবে রাজী হইনি বলে ওরা আমাকে শাসিয়েছিলো আমার সর্বনাশ করে ছাড়বে।

প্রস্তাবটা কি ছিলো আঙ্কল? নরম গলায় প্রশ্ন করলো রিনি।

আমি তখন ওয়ারসতে রয়েল প্যালেস মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ। পাঁচ ছশ বছরের পুরোনো বহু বিখ্যাত শিল্পীর মূল্যবান সব পেইন্টিং রয়েছে। মাফিয়াদের ডন ভিত্তালি আমাকে বললো রাফায়েলের একটা পেইন্টিং ওখান থেকে সরিয়ে এনে ওকে দিতে। আমি বললাম অসম্ভব, আমার প্রাণ থাকতে রয়েল প্যালেসের কুটোটিও কেউ নাড়তে পারবে না। শুনে ডন ভীষণ ক্ষেপে গেলো। এমন এক অবস্থা করলো যে আমাকে পোল্যান্ড ছেড়ে পালাতে হলো লন্ডনে। কিছুদিন সেখানে ভালো ছিলাম। পরে ওরা টের পেয়ে আমার মেয়েকে হত্যা করলো। এই বলে মারাওস্কি আবার চোখ মুছলেন। মাফিয়ারা এখন আপনার কাছে কি চায়? আপনি তো রয়েল প্যালেসে আর নেই। একজন পেশাদার রহস্যভেদীর মতো প্রশ্ন করলো জনি।

এখন চায় আমার ওয়ারস গ্যালারীর দুটো ছবি। অতি পুরোনো দুজন জার্মান পেইন্টারের কাজ রয়েছে গ্যালারির পার্মানেন্ট ডিসপ্লেতে।

না দিলে আপনাকে মেরে ফেলবে?

তাই তো বলছে। তবে ছবি দিলেও ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে না। রয়েল প্যালেসের ছবিটা এখনো ওরা বাগাতে পারে নি। ওরা জানে আমি ছাড়া এই অসম্ভব কাজ আর কেউ করতে পারবে না। প্যালেসের দুটো গোপন পথের সন্ধান শুধুমাত্র আমিই জানি।

তাহলে তো রাফায়েলের ছবি না পাওয়া পর্যন্ত আপনাকে ওরা মারবে না।

না মারুক, ধরে নিয়ে যদি ওদের টর্চার চেম্বারে একবার ঢোকাতে পারে, গোপন পথের কথা না বলে পারবো না।

আমাদের সঙ্গে কি কথা বললেন এটা ওরা জানতে চায় কেন?

মৃত্যু ঘনিয়ে এলে মানুষ যাকে বিশ্বাস করে গোপন সব কথা তাকে বলে যায়। ভেবেছে তোমাদের হয়তো রয়েল প্যালেসের গুপ্ত পথের সন্ধান দিয়ে যাবো।

তার মানে মাফিয়ারা আমাদের ওপরও নজর রাখছে? আমি কখন কার সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলছি সব কিছু ওরা লক্ষ্য করছে।

রিনি বললো, আমরা যতক্ষণ আছি আপনার কোনো ভয় নেই। এয়ারপোর্টে আমাদের জন্য গাড়ি আসবে। দূতাবাসের গাড়ি কেউ ছুঁতেও সাহস পাবে না।

রিনির কথা শুনে মনে হলো মারাওস্কি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি এবার একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবো। এই বলে সত্যি তিনি ঘুমিয়ে গেলেন।

ঘড়ি দেখে রিনি হিসেব করে রেখেছিলো ওয়ারস পৌঁছবে বিকেল চারটায়। তার মানে পরিষ্কার ঝলমলে বিকেল। ওয়ারসতে যখন ওরা নামলো তখন ওর ঘড়িতে চারটা বাজলেও বাইরের আকাশে গোধুলির ছায়া নামছে। টাইম যোনের কথা ওর মনে ছিলো না। লন্ডনের বিকেল চারটা হচ্ছে ওয়ারসর সময় সাড়ে পাঁচটা। মারাওস্কি সঙ্গে থাকাতে ব্যাগ খুঁজে বের করে ইমিগ্রেশনের ঝামেলা মেটাতে ওদের মোটেই বেগ পেতে হয় নি। ওরা প্রমাদ গুনলো বাইরে এসে। ভেবেছিলো মামার গাড়ি অপেক্ষা করবে ওদের জন্য। কোথাও কোন কূটনীতিক নম্বরওয়ালা গাড়ি চোখে পড়লো না।

মারাওস্কি ওদের অসহায় অবস্থা দেখে বিচলিত হলেন। বললেন, রিনি, তুমি বলছিলে তোমার আঙ্কলের ঠিকানা আছে তোমার সঙ্গে। ওটা কি দেখাবে আমাকে?

রিনি ওর ব্যাগ থেকে ঠিকানা বের করে দিলো। দেখে মারাওস্কি বললেন, আমাকে ট্যাক্সি নিতে হবে। যদি চাও আমি তোমাদের নামিয়ে দিতে পারি।

রিনি যেন হাতে চাঁদ পেলো। তবু গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললো, আমাদের ঠিকানা কি আপনার পথে পড়বে?

ঠিক পথে পড়বে না। তবে ট্যাক্সি সামান্য ঘুরিয়ে নিলে কোনো অসুবিধেও হবে না।

কোথায় আমরা আপনাকে লিফট দেবো, উল্টো আপনার কাছ থেকে লিফট নিচ্ছি।

একই কথা। চলো, ট্যাক্সির জন্য আবার লাইন দিতে হবে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ওয়ারসতে ওদের স্বাগত জানাতে গিয়ে ওভারকোট, পুলোভার সব ফুটো করে হাড়ে কাপন ধরালো।

৩-৪. রাজপ্রাসাদে আরেক মারাওস্কি

০৩. রাজপ্রাসাদে আরেক মারাওস্কি

ওয়ারস শহর যেখানে শেষ হয়ে গ্রাম শুরু হয়েছে ঠিক সেখানে রিনি জনির মনু মামার বাড়ি। লাল আকাশের পটভূমিতে কাঠের রেলিং ঘেরা অনেক খানি জায়গা জুড়ে কটেজের মতো বাড়িটাকে মনে

হচ্ছিলো ভিউ কার্ডের ছবির মতো। হালকা নীল বর্ডার দেয়া ধবধবে সাদা রঙের কাঠের দোতালা বাড়ি, পেছনে পাথরের চিমনি থেকে ধোয়া উড়ছে। চারপাশে আপেল আর নাশপাতির গাছ। বাড়ির পেছনে কাঠের ঘেরা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে বিশাল এক মাঠ। গরম কালে ওখানে আলুর চাষ হয়। শীত আসার আগেই সব আলু তুলে মাটির তলায় খড় বিছিয়ে রেখে দেয়া হয়, পরের মৌসুমের জন্য।

মারাওস্কির ভাড়া করা ট্যাক্সিওয়ালা নম্বর মিলিয়ে মনু মামার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দুবার হর্ন টিপলো। তারপর পেছনের বনেট খুলে রিনি জনির হাতব্যাগ আর স্যুটকেস নামিয়ে দিলো।

হর্নের শব্দ শুনে সবার আগে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এলো বিশালদেহী এক গ্রে হাউন্ড কুকুর। তার পেছনেই ছুটতে ছুটতে এলো মনু মামার মেয়ে শীলা, জনির চেয়ে দুবছরের ছোট, গায়ের রঙও জনির মতো শ্যামলা দুচোখে দুষ্টমির ঝিলিক, চুলগুলো উঁচু করে বাধা লাল পলকা ডটের ফ্রকের সঙ্গে ম্যাচ করা চওড়া রিবন দিয়ে। শীলা ছুটে এসে রিনিকে জড়িয়ে ধরলো–হাই রিনি আপু, জনি ভাইয়া, তোমাদের না কাল সকালে আসার কথা!

শীলার পেছন পেছন হাসিখুশি মনু মামা আর রাশভারি মনু মামী বেরিয়ে এসেছেন। মনু মামা অবাক হয়ে বললেন, কীভাবে এলি তোরা? আমাকে একটু আগেও লট-এর অফিস থেকে বললো তোদের ফ্লাইট ফ্র্যাঙ্কফুর্টে আটকা পড়েছে, কাল সকালের আগে পৌঁছবে না।

আটকা পড়েছে ঠিকই, আমরা অন্য ফ্লাইটে এসেছি। এই যে মারাওস্কি চাচা, ইনি ব্যবস্থা করেছেন। এই বলে রিনি মারাওস্কিকে পরিচয় করিয়ে দিলো বাংলাদেশের রাষ্টদূতের সঙ্গে। মনু মামা তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে চলুন, আমাদের সঙ্গে এক কাপ কফি পান করবেন।

মারাওস্কি ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আজ খুব তাড়া আছে। আরেক দিন এসে খাবো। বাড়ি তো চিনেই গেলাম।

রিনি বললো, আমরা ওয়ারস থাকতে থাকতেই আসবেন।

নিশ্চয় আসবো লক্ষ্মী মেয়ে। এই বলে রিনি, জনি আর শীলাকে আদর করে মারাওস্কি বিদায় নিলেন।

শীলাদের গম্ভীর মুখো গ্রে হাউন্ড স্পটি এরই মধ্যে জনির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ওর গায়ে মাথা ঘষে আদর জানাচ্ছে। মনু মামা অতি কষ্টে ওদের ভারি স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে যেতে বললেন, চল, ভেতরে যাই। যে ঠাণ্ডা পড়েছে আজ রাতে নির্ঘাত বরফ পড়বে।

মামী রাশভারি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের আব্দু আম্মু কেমন আছেন রিনি?

ভালো আছেন। মা আপনার জন্য কাশ্মিরী স্কার্ফ পাঠিয়েছেন।

গতবার বলেছিলাম তোমার মাকে। গম্ভীর গলায় বললেন মামী।

ড্রইংরুমে বসে মামা বললেন, তোদের সাহস তো কম নয়। বুড়ো পেইন্টারটা না থাকলে একা এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসতি কী করে?

মামার গলায় উদ্বেগ দেখে রিনি হেসে ফেললো–শোন মামা, লন্ডন থেকে মাঝপথে প্লেন বদলে ওয়ারস আসতে পারলাম আর এয়ারপোর্ট থেকে তোমাদের ঝোরনি আসতে পারবো না–এতটা বোকা ভাবছো কেন?

জনি বললো, তবে এটাও ঠিক আপু মারাওস্কি চাচা না থাকলে আমরা আমাদের ফ্লাইটেই আসতাম, মামাও সময়মতো এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাতে পারতেন।

যা হবার হয়েছে। মামী বললেন, রিনি জনি মুখ হাত ধুয়ে নাও। শীলা তোমাদের ঘর গুছিয়ে রেখেছে। আধঘন্টা পর সবাইকে ডিনারে ডাকা হবে।

এসো রিনি আপু, জনি ভাইয়া। তোমাদের ঘর ওপরের তলায়, আমার ঘরের ঠিক পাশে। এই বলে ওদের হাত ব্যাগ দুটো নিয়ে শীলা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ধুপধাপ শব্দ করে ওপরে গেলো।

রিনি দেখলো ওর পায়ের শব্দে মামীর কপালে ভাঁজ পড়েছে।

জনি উঠে ওদের ভারি স্যুটকেসটা ওপরে নিতে যাবে–মামী বললেন, ওটা ওখানে থাক এর পর সামান্য গলা তুলে ডাকলেন–আঁদ্রে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো ঝাড়া সাত ফুট লম্বা দশাসই শরীরে সুন্দর চেহারা এক পোলিশ যুবক। মামী ওকে পোলিশ ভাষায় কি যেন বললেন। আঁদ্রে একটু হেসে রিনি জনিকে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালো। তারপর ছত্রিশ কেজির ভারি জাম্বো স্যুটকেসটা খেলনার মতো তুলে নিয়ে ওপরে চলে গেলো। রিনি জনির বিস্ময় দেখে মামা বললেন, আঁদ্রে আমাদের বাড়িতে কাজ করে। দুহাতে চার মণ ওজন অনায়াসে তুলে ফেলে। অথচ বেচারা কথা বলতে পারে না।

জনি বললো, আমি বাজি ধরতে পারি মামা। স্টালোন, শোয়ার্জনিগার কেউ আঁদ্রের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পারবে না।

ওরা কারা? কুস্তিগীর নাকি!

না মামা। ফিল্ম অ্যাকটর। বেচারা আঁদ্রে, কথা বলতে পারলে সিনেমার প্রডিউসাররা ওকে লুফে নিতো।

ওপর থেকে শীলা ডাকলো, রিনি আপু, তোমরা আসছো না কেন?

যাই। বলে রিনি ছুটে সিঁড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। মামীর কপালে ভাঁজের কথা মনে পড়ায় পা টিপে টিপে ওপরে উঠলো।

ওকে ওভাবে পা টিপে হাঁটতে দেখে শীলা অবাক হয়ে বললো, তোমার পায়ে কি হয়েছে রিনি আপু? ব্যথা পেয়েছো?

রিনি মুখ টিপে হাসলো–তুমি যেভাবে ধুপধাপ করে ওপরে উঠেছে, দেখ নিতে মামীর কপালে কয়টা ভাঁজ পড়েছে।

জানি। শীলা হেসে বললো, কি করবো, মনে থাকে না যে!

শীলার কথা শেষ না হতেই কাঠের সিঁড়িতে বেদম শব্দ করে জনি ওপরে উঠলো। রিনি বড় বড় চোখে একবার জনিকে আরেকবার শীলাকে দেখলো। শীলা ঝর্ণার মতো বাঁধভাঙা হাসিতে গড়িয়ে পড়লো। জনি অবাক হয়ে রিনি আর শীলাকে দেখলো। নিশ্চয় কোনো মেয়েদের ব্যাপার হবে–এই ভেবে গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকলো।

খাবার টেবিলে আয়োজন দেখে রিনি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলো আর জনির চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠলো। মামী বাঙালী খাবারই তৈরি করেছেন। দুরকমের মাছ রান্না, মুরগী, ফুলকপি ভাজি আর নিরামিষ। ওরা টেবিলে বসতেই আঁদ্রে আস্ত একটা ভাপানো রুই মাছ বড় ডিশে করে টেবিলের মাঝখানে রাখলো। রুই মাছটার ওপর সস আর গাজর, মটরশুটি সেদ্ধ ছড়ানো। জনি বলেই ফেললো, দেখে মনে হচ্ছে দারুণ ডেলিশাস হবে।

রিনি শুকনো মুখে শীলার পাশে বসে এক টেবিল চামচ ভাত আর দুচামচ নিরামিশ তুলে নিলো ওর প্লেটে। মামী প্রথমে কিছু বললেন না। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে ওটুকু খেয়ে ও যখন ফুট সালাদের দিকে হাত বাড়ালো মামী গম্ভীর হয়ে বললেন, ওটা সবার। শেষে খেতে হয় রিনি।

রিনি কাষ্ঠ হেসে বললো, আমার খাওয়া শেষ মামী।

জনি তখন মাছ শেষ করে মাংশের পর্ব শুরু করেছে। খেতে খেতে বললো, ও রাতে কিছুই খায় না মামী। ডায়েটিং করে।

ডায়েটিং করার বয়স এটা নয়। এই বলে মামী ওর পাতে বড় এক টুকরো স্যামন মাছ তুলে দিলেন–যখন আমাদের মতো বয়স হবে তখন হিসেব করে খাবে। তোমরা না খেলে এত রান্না করলাম কেন?

জনি বললো, বাড়িতে আম্মুও ওকে একথা বলেন।

তোমার মোড়লি করতে হবে না। রিনি শুকনো মুখে মাছের টুকরো খুঁটে মুখে দিলো যেন দায়ে পড়ে এন্টিবায়োটিক খাচ্ছে।

খাওয়া শেষ করে সবাই ড্রইং রুমে বসলো। টেলিভিশনে তখন দুর্ধর্ষ এক ফাইটিং ছবি হচ্ছিলো। ভাষা না বুঝলেও জনি নিবিষ্ট মনে ছবি দেখতে লাগলো। পাইপে আগুন ধরিয়ে একগাল ধোয়া ছেড়ে মামা বললেন, তোমাদের জন্য আমি বারো দিনের চমৎকার একটা প্রোগ্রাম বানিয়ে রেখেছি। মনে হয় রিনি জনির অপছন্দ হবে না।

রিনি কোনো কথা বললো না। ও ভাবছিলো বারো দিন যদি এ ধরনের রিচ ফুড খেতে হয় তাহলে নির্ঘাত ওর ওজন তিন থেকে চার পাউন্ড বেড়ে যাবে। কী ভয়ানক কথা!

রাতে ওদের ঘরে ঘুমোতে এসে নিজের এই আশঙ্কা জনিকে না বলে পারলো না রিনি। বাইরে তখন ঝুর ঝুর করে সাদা তুলোর মতো তুষার পড়ছে। ডবল কাঁচ লাগানো বড় জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তুষার পড়া দেখতে দেখতে জনি বললো, ঘাবড়াচ্ছিস কেন আপু! আজ প্রথম দিন বলে একটু বেশি রান্না হয়েছে। রোজ কি আর এরকম হবে!

রিনি ওর বিছানায় কম্বলের তলায় ঢুকে বললো, তোর কি কোনো চিন্তা আছে! রোজ এরকম হলেই তো তুই খুশি।

নারে আপু! মামী শুধু আমার জন্য রোজ এত কষ্ট করবেন না। শুয়ে পড়লি কেন? কি চমৎকার স্নো ফল–দেখ না। ওই উঁচু জায়গাটা দেখ আপু। বাড়ির পেছনে খোলা প্রান্তরের এক জায়গায় আঙ্গুল দিয় দেখালো জনি–মনে হচ্ছে মস্ত বড় একটা সুইস কেক।

রিনির দুচোখে তখন ঘুম নেমেছে। জড়ানো গলায় বললো, খেতে হয় তুই খা। আমি ঘুমিয়ে গেলাম।

তুষার পড়া দেখতে জনির সব সময় ভালো লাগে। ছুটির দিনে ঘুম থেকে উঠেই পার্কে ছোটে। ওর কাছাকাছি বয়সের পাড়ার ছেলে মেয়েরা সেখানে প্রতিযোগিতায় নামে কারা কত সুন্দর স্নো ম্যান বানাতে পারে।

সকালে নাশতার অফিসে মামা শীলাকে বললো, শোয়েবকে আমি ফোন করে দিয়েছি। ওর বাবাকে অফিসে ড্রপ করে দশটার ভেতর চলে আসবে। পোল্যান্ডে শোয়েবের চেয়ে ভালো গাইড তোমরা পাবে না।

শোয়েব কে মামা? জানতে চাইলো রিনি।

আমাদের এম্ব্যাসির কাউন্সিলার মাহবুব সাহেবের ছেলে। এ লেভেল শেষ করে এ বছর ওয়ারস ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। আমাদের চেয়ে বেশি দিন ধরে ওরা ওয়ারসতে আছে।

শীলা বললো, জানো রিনি আপা, শোয়েব ভাই গত বছর ফরেন মিশন আইস স্কেটিং টুর্নামেন্টে ফার্স্ট হয়েছে।

দারুণ তো! জনি উত্তেজিত গলায় বললো, আমি তাহলে এখান থেকে স্কেটিংটা শিখে নেবো।

দশটা বাজার দশ মিনিট আগেই এসে গেলো শোয়েব। তামাটে রঙের ছিপছিপে গড়নের ধারালো চেহারার তরুণটিকে দেখেই রিনি জনির ভালো লেগে গেলো। ওরা সবাই আপেল গাছের তলায় স্নো ম্যান বানানোর কসরৎ করছিলো। বাইরের দরজায় শোয়েবের গাড়ি থামতেই সবাই ছুটে গেলো সেখানে। শোয়েব গাড়ি থেকে নেমে মৃদু হেসে বললো, হ্যালো এভরিবডি। আঙ্কলকে দশটা বলেছিলাম। দশ মিনিট আগে আসার জন্য নিশ্চয় কিছু মনে করো নি।

শীলা উচ্ছ্বসিত গলায় বললো, আব্লু বলার পর থেকে ঘড়ি দেখছি কখন দশটা বাজবে। এসো, এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।

আমি জানি। তুমি হচ্ছে রিনি আর তুমি জনি। হেসে বললো শোয়েব।

ওর হাসির জবাবে রিনিও হাসলো। জনি এগিয়ে এসে শোয়েবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড়দের মতো করে বললো, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হয়েছি শোয়েব ভাই।

শোয়েব বললো, ভাই বললে আপনি বলা চলবে না, রাজী?

জনি হেসে বললো, রাজী।

রিনি কিছু বলতে পারলো না। কোনো কারণ ছাড়াই ও লজ্জায় লাল হচ্ছিলো। পরির মতো সুন্দর মেয়েটি কিন্তু আমার সঙ্গে এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলে নি।

শোয়েবের কথায় রিনি আরো লাল হয়ে বললো, মোটেও আমি সুন্দর নই।

শোয়েবের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসলো–যাক, শেষ পর্যন্ত কথা বললো।

রিনি লক্ষ্য করলো হাসলে শোয়েবকে দারুণ হ্যান্ডসাম লাগে। একেই মনে হয় ভুবনজয়ী হাসি বলে। ওর কথা ভাবতে গিয়ে রিনির ফর্সা গালে পাকা আপেলের রঙ ধরলো। বুঝতে পেরে শোয়েব আবার হাসলো।

শীলা বললো, আজ কি প্রোগ্রাম শোয়েব ভাই?

প্রথমে মিউজিয়াম। তারপর ওল্ড সিটিতে লাঞ্চ। লাঞ্চের পর রয়েল প্যালেস।

আগামী কাল? জানতে চাইলো জনি।

এশিয়া প্যাসেফিক সেন্টার। বোট রাইডিং উইথ লাঞ্চ। এরপর বোটানিক্যাল গার্ডেন।

তারপর? জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আরো লাল হলো রিনি।

শোয়েব হেসে বললো, ওয়ারস থেকে অনেক দূরে। ওল্ড মিউজিয়াম সিটি ক্র্যাকভ। নাইট স্টে। সল্ট মিউজিয়াম...

শীলা বাধা দিয়ে বললো, থাক থাক শোয়েব ভাই। আগে সব বলে ফেললে সারপ্রাইজ দেয়ার মতো কি আর থাকলো। চলো বেরিয়ে পড়ি।

যথাসময়ে সারপ্রাইজও দেবো। হাসি চেপে গম্ভীর মুখে গাড়িতে উঠতে উঠতে বললো শোয়েব।

স্পটিকে বারান্দায় শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। শীলা ওকে ফেলে গাড়িতে উঠছে দেখে মহা চিৎকার জুড়ে দিলো। ভেতর থেকে শীলার মা এসে ধমক দেয়ার পর থামলো। শোয়েব ততক্ষণে গাড়িতে পুরো স্পীড তুলেছে! শীলা বললো, স্কুলে যাওয়ার সময় স্পটি কিছুই বলে না। অন্য সময় কোথাও গেলেই ও সঙ্গে যেতে চাইবে। না নিলে রেগে টং হয়ে যায়।

শোয়েব বললো, আমার সঙ্গে বেরোলে যে ওর রাগ বেড়ে যায় ওটাও বলো। আজ পর্যন্ত এমন একটা কুকুরের দেখা পেলাম না যেটা আমাকে পছন্দ করে। দেখলেই এমনভাবে তাকায় নয়তো ঘোয়াও করে ওঠে–রাগে পিত্তি জ্বলে যায়।

রিনি বললো, মানুষের পছন্দটা কুকুরের পছন্দের চেয়ে বেশি জরুরী।

ভালো বলেছো। গলা খুলে হাসলো শোয়েব। সব মানুষ না হলেও কোনো কোনো মানুষ যে পছন্দ করে সেটা আমি ঠিকই বুঝতে পারি, বিশেষ করে যাদের আমি পছন্দ করি।

শীলা বললো, অন্য কুকুরের কথা জানি না। তুমি যদি স্পটিকে ভালোবাসো, স্পটিও তোমাকে ভালোবাসবে। ও খুব লক্ষ্মী কুকুর।

জনি বসেছিলো সামনে, শোয়েবের পাশের সিটে। বললো, তোমাদের মিউজিয়াম কি খুব ভালো?

তোমরা কি বৃটিশ মিউজিয়াম দেখেছো? পাল্টা প্রশ্ন করলো শোয়েব।

রিনি বললো, অনেক বার দেখেছি।

গাড়ি চালাতে চালাতে শোয়েব বললো, বৃটিশ মিউজিয়ামের তুলনায় এটা কিছুই । তবে আমার দেখতে ভালো লাগে। পরিবেশটা খুব ঘরোয়া।

মিউজিয়াম দেখতে গিয়ে মুগ্ধ কিংবা বিস্মিত হওয়ার মতো কিছু পেলো না জনি। ওর কাছে বৃটিশ মিউজিয়ামের তুলনায় খুবই গরিব মনে হলো। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করলে নিশ্চয় দারুণ কিছু। রিনির অবশ্য ততটা খারাপ লাগে নি। কারণ আর কিছু নয়, শোয়েব যেভাবে পোলিশ ভাষায় বিবরণ পড়ে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলো, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলো রিনি। ভাবছিলো কখনো সুযোগ পেলে বলবে রবীন্দ্র সঙ্গীতের জন্য শোয়েবের গলা খুব ভালো। কে জানে গায় কি না।

মিউজিয়াম দেখে ওরা যখন ওল্ড সিটিতে খেতে এলো ঘড়িতে তখন প্রায় দুটো বাজে। পুরোনো দিনের বনেদী প্যাটার্নের বাড়ি দিয়ে তিন দিক ঘেরা বিশাল এক চত্বরে গাড়ি পার্ক করে রাখলো শোয়েব। এক দিকে খোলা চত্বরে রেস্তোরাঁর চেয়ার সাজানো রয়েছে। আরেক দিকে দেখলো হাতে আঁকা ছবির পশরা নিয়ে বসেছে কয়েকজন। রিনি ওদের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাতেই শোয়েব বললো, দেখবে নাকি! এরা সবাই শিল্পী।

ছোট থাকতেই ছবি আঁকার দারুণ শখ রিনির। বললো, আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করছে।

এগুলো একটা দেখার জিনিষ হলো আপু। জনি মুখ ভার করে বললো, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রিনি ওর কাছে এসে চাপা গলায় বললো, সবার সামনে ক্ষিদে ক্ষিদে বলতে লজ্জা করে না তোর?

মুখ কালো করে জনি বললো, বারে, খিদে পেলে বুঝি বলবো খিদে পায় নি।

শোয়েব হেসে বললো, ঠিক আছে রিনি। আমরা বরং খেয়ে নিই আগে। তুমি কিছু মনে কোরো না। শুধু জনির নয়, খিদে আমারও পেয়েছে।

তবে? উত্তেজিত গলায় জনি বললো, আমরা কি তোর মতো ডায়টিং করছি যে খিদে পেলেও না খেয়ে থাকবো?

রিনি কাঁধ নাচিয়ে অসহায় চোখে তাকালো শীলার দিকে। শীলারও খিদে পেয়েছিলো। কথাটা বলা ঠিক কতটা মার্জিত হবে সেটাই ভাবছিলো ও। ছেলেরা বলাতে ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। রিনিকে বললো, চলো রিনি আপু। আমি দেখেছি খিদে পেলে ছেলেদের মাথা গরম হয়ে যায়।

মেয়েরা বুঝি খিদে পেলে ঠাণ্ডা মাথায় অঙ্কের লেসন নিয়ে বসে! ফোড়ন কাটলো জনি।

শীলা বললো, তুমি বোধহয় জানো না জনি ভাইয়া, আব্দু বলেছেন ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা অঙ্ক ভালো পারে।

লাঞ্চে ওরা বেশি কিছু খেলো না। সেদ্ধ আলু, মাংসের স্টু আর সজির সালাদ ভাগ্যিস সেদিন রিনির মাংস খাওয়ার তারিখ ছিলো। নইলে শুধু সালাদ খেতে হতো।

খুব সস্তায় ওদের খাওয়া হয়ে গেলো। শোয়েব রিনিকে বললো, আমরা চারজন খেলাম, হিসেব করলে পুরো তিন পাউন্ড খরচ হয় নি। লন্ডনে এ খাবার খেতে কম করে হলেও তিরিশ পাউন্ড লাগবে।

তুমি কবে লন্ডনে গেছো শোয়েব ভাই? জানতে চাইলো জনি।

কয়েকবারই গিয়েছি। শেষ গিয়েছি গত সামারে।

বাইরে থেকে রয়েল প্যালেস দেখে রিনি জনি বেশ হতাশ হয়েছিলো। লন্ডনের গ্রামেও এ রকম সাদামাটা ক্যাসেল দেখা যায়। ভেতরে গিয়ে ওদের মাথা ঘুরে গেলো।

টিকেট কেটে ঢুকতেই এক জায়গায় ওদের জুতো খুলে নরম কাপড়ের চটি পরতে হলো। নাকি মেঝের কারুকার্য করা মার্বেল ক্ষয়ে যাবে। প্রত্যেক ঘরে আসবাবপত্র ছাড়াও দেয়ালে ছাদে সবখানে পেইন্টিং–এর ছড়াছড়ি। মারাওস্কি বুড়ো মিথ্যে বলেনি। পাঁচশ, ছশ বছরের পুরোনো বিখ্যাত সব শিল্পীর আঁকা। সব ছবি কারুকার্য করা সোনার ফ্রেমে বাঁধানো, দেয়ালের নকশায় সোনার কাজ, দরজার হাতল আর নকশা নিরেট সোনার তৈরি। গোটা রাজপ্রাসাদে নাকি কয়েক হাজার কেজি সোনা আছে।

রাজার সিংহাসন দেখে জনি বললো, ইচ্ছে করছে একটু বসে দেখি।

চারপাশে প্রহরীদের ভয়ে জনির সাহস হলো না। শোয়েব বলল, এ সিংহাসনে শেষ বসেছেন পোপ জন পল।

শোয়েব নিজে গাইডের কাজ করছিলো বলে ইচ্ছে মতো ঘুরে ঘুরে সব দেখতে পারছিলো ওরা। যারা গাইডেটুর নিয়েছে, দল বেঁধে সব গাইডের পেছন পেছন ঘুরছে। নিজের পছন্দ মতো কোনো জায়গায় যেতে পারছে না। এর ভেতর আর্ট স্কুলের ছেলে মেয়েরা মাঝে মাঝে বসে কোনো বিখ্যাত ছবি কপি করছে। এ রকম দৃশ্য রিনি জনি লন্ডনের অনেক গ্যালারিতেও দেখেছে।

হঠাৎ রিনি লক্ষ্য করলো বুড়ো মারাওস্কি রানির শোয়ার ঘরের এক কোণে বসে অনেক পুরোনো একটা পেইন্টিং কপি করছেন। কাছে গিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, মারাওস্কি চাচা, আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাবে ভাবি নি!

রিনির হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ো জার্মান ভাষায় বললেন, আমি দুঃখিত। আমার মনে হয় না তোমাদের সঙ্গে আমার কখনো পরিচয় হয়েছে।

বুড়োর কথা শুনো রিনি অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। না, এই বুড়ো দেখতে যদিও মারাওস্কির মত, তবে মারাওস্কি নয়। এর বয়স অন্তত দশ বছর বেশি হবে। গলার স্বরও একেবারে অন্যরকম। আসল

মারাওস্কি জার্মান বলতে পারে না। রিনি জার্মান ভাষায় মাপ চেয়ে বললো, আমাদের এক পরিচিত পেইন্টারের সঙ্গে আপনার চেহারা গুলিয়ে ফেলেছিলাম। আশা করি কিছু মনে করবেন না।

এরকম হতেই পারে। বুড়ো রিনিকে আশ্বস্ত করে বললেন, আজ সকালেও শুকনো মতো একটা লোক আমাকে তোমাদের মতো ভুল করেছিলো মারাওস্কি ভেবে। আমার মতো দেখতে লোকটা নিশ্চয় ওয়ারস থাকে। দেখতে হবে এত ভুল কি করে হয়।

আপনি কি রোজ আসেন এখানে?

আরও এক মাস আসতে হবে। এখানে আমি থার্টিনথ সেঞ্চুরির কয়েকজন জার্মান পেইন্টারের ওপর কাজ করছি।

ঠিক আছে। আঙ্কল মারাওস্কিকে আপনার কথা বলবো।

এই বলে রিনিরা ওখান থেকে চলে এলো। জনি বললো, ভালো করে দেখলে এ ভুল তুই করতি না আপু। চেহারায় কিছু মিল আছে, তবে আমাদের চাচার চেয়ে অনেক বুড়ো।

ভুল আমি একা করিনি। রিনি শান্ত গলায় বললো, আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে বলবো মাফিয়ার লোকেরাও একই ভুল করেছে।

এখানে আবার মাফিয়া কোথায় পেলে রিনি? অবাক হয়ে জানতে চাইলো শোয়েব।

মারাওস্কি নিজের সম্পর্কে যা বলেছিলেন সব কথা ওকে খুলে বললো রিনি। শেষে যোগ করলো, আমার মনে হয় ওরা এখানেও বুড়োকে ফলো করছে।

কী সাংঘাতিক! এত বড় একজন পেইন্টারকে ওরা মেরে ফেলবে? অসহিষ্ণু গলায় বললো শোয়েব।

এখন না মারলেও পরে মারবে। জবাব দিলো রিনি।

শীলা বললো, কে কাকে মারবে এসব কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। শোয়েব ভাই তো রিনি আপুদের শহরটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারো।

রিনি যদি চায় আনন্দের সঙ্গে পারি। এই বলে শোয়েব রিনি আর শীলার জন্য গাড়ির পেছনের দরজা খুলে মাথাটা এমনভাবে নোয়ালো যেন ও শোফারের কাজ করছে। বলা বাহুল্য রিনির ভালো লাগার ব্যারোমিটারের পারদ আরও খানিকটা ওপরে উঠলো।

জনি একটু গম্ভীর হয়ে সামনের সিটে বসলো। মেয়ে দুটোকে শোয়েব কেন এত পাত্তা দিচ্ছে এটা ওর বোধগম্য হলো না। বিটলস-এর লেট ইট বি গুণগুণ করে গাইতে গাইতে শোয়েব গাড়িতে স্পিড তুললো।

.

০৪. ক্র্যাকভে মাফিয়ার চর

পরের দিন রিনিদের সব কিছু রুটিন মতো ঘুরিয়ে দেখিয়ে সন্ধ্যার দিকে শোয়েব ওদের নিয়ে গেলো নিজেদের বাড়িতে। আগে থেকেই বলা ছিলো রাতে রিনি, জনি আর শীলা ওদের বাড়িতে খাবে।

শোয়েবের মাকে দেখে রিনির খুব ভালো লেগে গেলো। মনু মামীর মতো মেপে মেপে কথা বলা, এটিকেট আর ম্যানারের কোনো পরোয়া করেন না। মোটাসোটা, হাসি খুশি সাধারণ বাঙালী মহিলা, রিনিকে দেখেই–এসো মা এসো। এক্কেবারে পরিপুতুলের মতো দেখতে। কাল রাত থেকে শোয়েব তোমাদের কথা বলতে বলতে বাড়ির সবার কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। কাল ভেবেছিলাম বুঝি বাড়িয়ে বলছে। এখন মনে হচ্ছে একটুও বাড়িয়ে বলে নি। এসো মা শীলা। তুমিও এসো বাবা। এই বলে জনিকে বুকে টেনে নিলেন শোয়েবের মা।

বাইরের ঘরে ওদের কথা শুনে ভেতর থেকে শোয়েবের বাবাও বেরিয়ে এলেন। মনু মামার চেয়ে বয়সে কিছুটা ছোট হবে। স্মার্ট চেহারা। শোয়েব অবিকল ওর বাবার মতো দেখতে। হাসিমুখে তিনি রিনিকে জিজ্ঞেস করলেন, ওয়ারস কেমন লাগছে মা? শোয়েব সব কিছু ঠিক মতো দেখাচ্ছে তো?

রিনি বললো, ভারি সুন্দর শহর ওয়ারস।

জনি বললো, শোয়েব ভাই গাইডের চাকরি করলে অনেক টাকা কামাতে পারতেন।

হা হা করে হেসে শোয়েবের বাবা বললেন, গত মাসে ব্রাসেলস থেকে আমাদের ইইসির অ্যাম্বাসাডর এসেছিলেন এখানে এক কনফারেন্সে। তিনিও বলেছেন শোয়েব একেবারে পাকা গাইডের মতো সব বুঝিয়ে বলতে পারে। শেষকালে মনে হয় ও গাইডই হবে।

শোয়েব বললো, যতোই বলো বাবা, গাইড হওয়ার জন্য নিশ্চয় আমি অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স পড়ছি না।

শোয়েবের মা বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবে নাকি! সবাই ভেতরে চলো।

রিনিদের নিজের ঘরে নিয়ে গেলো শোয়েব। ড্রইংরুমে একজন বিদেশী ভদ্রলোক বসেছিলেন। নাকি ফ্রেঞ্চ অ্যাম্বাসির ফার্স্ট সেক্রেটারি।

বাড়ির মানুষদের মতো শোয়েবের ঘরটাও ভালো লাগলো রিনির। মোটেও জনির ঘরের মতো লোমেলো নয়। দেয়াল ঘেঁষে মাঝারি সাইজের বিছানা, পাশে পড়ার টেবিল চেয়ার, এ পাশের দেয়ালে দুটো গদিমোড়া চেয়ার সব কিছু পরিপাটি করে গোছানো। দেয়ালে এলভিস প্রিসলি আর ম্যাডোনার দুটো বড় পোষ্টার। এলভিসেরটা সাদাকালো, ম্যাডোনার পোষ্টার রঙিন। পোষ্টারের পাশে দেয়ালে

ঝোলানো একটা স্প্যানিশ গিটার, আরেক দিকের দেয়ালে পোল্যান্ডের দুটো প্রাকৃতিক দৃশ্যের অয়েল পেইন্টিং।

গিটার দেখে রিনি বললো, শোয়েব ভাই, তুমি কি গান জানো?

জানি বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না, তবে চেষ্টা করি।

অত বিনয় দেখাতে হবে না শোয়েব ভাই। শীলা বললো, তোমার গান ছাড়া এখানকার বাঙালীদের যে কোনো অনুষ্ঠান জমে না, এ তুমি ভালো ভাবেই জানো।

ওই যে, কোন বনে যেন শেয়াল রাজা–সেরকম আর কি। শোয়েব হাসলো।

আমি কিছুই শুনতে চাই না শোয়েব ভাই। আমাকে স্প্যানিশ গিটার বাজানো শেখাতে হবে। বিচারকের রায় দেয়ার ভঙ্গিতে বললো জনি।

কি সর্বনাশ! আঁতকে ওঠার ভান করলো শোয়েব–আজ ভোরে বললে তোমাকে আইস স্কেটিং শেখাতে হবে সাত দিনে, এখন বলছো গিটার শিখবে–তাও নিশ্চয় সাত দিনে। এর ওপর তোমাদের গাইডগিরি। সাংঘাতিক একটা ক্র্যাশ প্রোগ্রাম নিতে হবে দেখছি।

জনি সব সময় ওরকম বলে। সব কিছু ওর শেখা দরকার, অথচ কোনো কিছুতেই লেগে থাকতে পারে না।

রিনির কথায় জনি খুবই বিরক্ত হলো। জবাব দেয়ার আগেই ওর চোখ পড়লো শোয়েবের টেবিলে ষ্টিফেন কিং-এর অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড কমিকটা রয়েছে। সব কিছু ভুলে গিয়ে মুহূর্তের ভেতর ও কমিক নিয়ে ডুবে গেলো।

শোয়েবদের বাড়ির সবই ভালো লেগেছিলো রিনির, শুধু খাবার টেবিলের আয়োজন ছাড়া। ওর অনুরোধে মনু মামী কাল কিছু আইটেম কমিয়েছেন কিন্তু এ টেবিলে যে এত আইটেম থাকবে ও স্বপ্নেও ভাবে নি। খাবার সময় ওর শুকনো মুখ দেখে শোয়েবের মা ভাবলেন রান্না বুঝি ভালো হয় নি, তাই বেচারি অনিচ্ছা নিয়ে খাচ্ছে। বললেন, বাড়িতে কাজের লোক নেই। রান্না মনে হচ্ছে ভালো হয় নি।

রিনি বললো, না চাচী, রান্না খুবই ভালো হয়েছে। রাতে আমি কম খাই।

কম খাওয়া মানে কি এই! শোয়েবের মা রিনির পাতে দু টুকরো মুরগির মাংশ তুলে দিলেন। বললেন, এ রান্নাটা আমার এক হাঙ্গেরিয়ান বান্ধবীর কাছ থেকে শিখেছি। একেবারে কম মশলা দিয়ে করা।

রিনির অসহায় অবস্থা দেখে জনি বললো, আপু, এ কদিনের জন্য তোর ডায়েট চার্ট ভুলে যা। ওটা বাড়ি গিয়ে ফলো করিস।

শোয়েবের বাবাও ঠিক মনু মামীর মতো বললেন, তোমাদের এ বয়সে কখনো ডায়েটিং দরকার হয় না। প্রচুর খাবে, খেলাধুলো করবে, গায়ে চর্বির চিহ্ন থাকবে না।

উপায় না দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিনি সবার কথা মেনে নিলো। খাওয়া শেষ হতে হতে সাড়ে নটা বাজলো। শোয়েবের বাবা বললেন, আজ আর রাত বাড়িয়ে কাজ নেই। এক রোববার সারাদিন কাটাবে এখানে।

রিনিরা আসাতে শীলার হয়েছে মজা। কোনো ফ্যামিলি পার্টি ছাড়া ওর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। শোয়েবের বাবার কথায় ও উৎফুল্ল হয়ে বললো, ক্র্যাকভ থেকে ফিরে এসেই আমরা পরের রোববারে পিকনিক করবো এখানে।

শহর থেকে শোয়েবদের বাড়ি শীলাদের বাড়ি থেকেও কিছু দূরে। যে জন্য কম ভাড়ায় অনেক জায়গাওয়ালা একটা ছবির মতো কটেজ পাওয়া গেছে। হেমন্তকালে লাল স্টবেরি আর র‍্যাপসবেরি পেকে ভরে থাকে পেছনের বাগানটা। শোয়েবের মা সেগুলো দিয়ে জ্যাম বানান, জুস বানান, পরিচিত সবার বাড়িতে পাঠান, তারপরও শেষ হয় না।

ঘরে ফিরতে ফিরতে শীলাদের সোয়া দশটা বাজলো। মনু মামা বললেন, দশ মিনিট আগে এলেই রিনি জনি তোমাদের মার সঙ্গে কথা বলতে পারতে। বলে দিয়েছি তোমরা খুব এনজয় করছে।

রিনি বললো, বলেছেন তো কি হারে ওজন বাড়ছে?

কি করে বলবো! অসহায় ভঙ্গিতে বললেন মনু মামা-দুদিনে কারো ওজন বাড়ে এ কথা আগে কখনো শুনি নি।

মামী গম্ভীর গলায় বললেন, সকাল ছটায় ক্র্যাকভের ট্রেন ধরতে হলে তোমাদের চারটায় উঠতে হবে। আশা করি সবার মনে আছে।

এতটুকু জিব কেটে শীলা–চলে এসো রিনি আপু, বলে সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ করে ওপরে উঠে গেলো। পেছন পেছন জনিও ছুটলো। রিনি ওর স্বভাব অনুযায়ী কোনো শব্দ না করেই ওপরে গেলো। ওর মামী মনু মামাকে বললেন, তোমার মেয়ের উচিৎ রিনির কাছে ম্যানার শেখা।

এসব মেয়েলি ব্যাপার তুমিই বোঝে। পাইপ টানতে টানতে মনু মামা সেদিনকার বিলেতি কাগজ গার্ডিয়ানে মনোযোগ দিলেন।

ভোর সোয়া পাঁচটায় স্টেশনে যাওয়ার জন্য শীলার মা রেডিও ট্যাক্সিকে রাতেই বলে রেখেছিলেন। পাঁচটা দশ মিনিটে ট্রাক্সি এসে বাইরের দরজায় দুবার হর্ন দিলো। রিনি, জনি, শীলা আগে থেকেই

তিনটা হাত ব্যাগ গুছিয়ে নাশতা খেয়ে তৈরি হয়ে ড্রইংরুমে বসেছিলো। শীলার বাবা এত সকালে ওঠেন না। সেদিন তিনি শীলাদের সঙ্গে নাশতা করে দ্বিতীয় পেয়ালা চা নিয়ে বসেছেন। ট্যাক্সির হর্ন শুনে শীলারা উঠে দাঁড়ালো। সবার গায়ে ওভার কোট, মাথায় টুপি, ভেতরে পর্যাপ্ত গরম কাপড়। তারপরও মামী বললেন, ক্র্যাকভ থেকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে এসো না। সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরে যাবে। পরশু সন্ধ্যায় স্টেশনে তোমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করবে।

তোমার হুকুমের কোনো নড়চড় হবে না আম্মু। এই বলে শীলা স্পটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বেরোলো। রিনি জনি ওকে অনুসরণ করলো। স্পটি বুঝতে পেরেছিলো হাজার চাচালেও ওকে নেয়া হবে না। করুণ মুখে তাকিয়ে শীলাদের যাওয়া দেখলো। ট্যাক্সি ছাড়ার পর ও গম্ভীর মুখে শীলার বাবার সোফার পাশে এসে বসলো।

শোয়েব ওদের জন্য টিকেট কেটে স্টেশনে অপেক্ষা করছিলো। ওদের দেখতে পেয়ে হেসে সম্ভাষণ জানালো, গুড মর্নিং এভরি বডি।

জনি বড়দের মতো, গুড মর্নিং বললো। রিনি মৃদু হেসে মাথা নাড়লো। শীলা বললো, কতক্ষণ আগে এসেছে শোয়েব ভাই? নিশ্চয় আমাদের মুণ্ডপাত করছিলে।

আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে করতাম। দশ মিনিট পর ট্রেন ছাড়বে। চলো উঠে পড়ি।

ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কেটেছিলো শোয়েব। রিজার্ভেশনও চেয়েছিলো। কাউন্টারের লোকটা বললো, তোমরা চারজন যাচ্ছে। একটা কামরা দিয়ে দিচ্ছি। অযথা রিজার্ভেশন টিকেট নিতে যাবে কেন?

শোয়েব বলরো, পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। কমিউনিস্ট আমলের কিছু ভালো লোক এখনো আছে দেখছি।

লোকটা শোয়েবের কথায় প্রসন্ন হেসে বললো, একজন সত্যিকারের কমিউনিস্ট সব সময় মানুষের উপকারই করে।

শোয়েবের পোলিশ বন্ধুরা কমিউনিস্টদের যখন তখন যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করলেও পাঁচ বছর ধরে এদেশে আছে ও। নিজের চোখেই দেখছে, এক বছর ধরে কমিউনিস্ট বিরোধীরা দেশ শাসন করতে গিয়ে অবস্থা কতখানি খারাপ করে ফেলেছে। দেশে বেকার বেড়েছে, গরিব মানুষেরা আগে যেসব সুযোগ সুবিধে পেতো–কম খরচে চিকিৎসা, কম ভাড়ায় বাড়ি, কম পয়সায় খাওয়া, বিনে পয়সায় স্কুল; সব বাতিল হতেয় গেছে। এক বছর আগেও যে সব কারখানার শ্রমিক সলিডারিটির নাম করে লাফ-ঝাঁপ করতো, তাদের অনেকেই বলছে কমিউনিস্ট আমলেই ভালো ছিলাম।

ট্রেন তখন পুরো স্পিডে ছুটে চলেছে দিগন্ত জোড়া বরফ ঢাকা প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে। শোয়েব কাঁচের বন্ধ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলো। গ্রামগুলোর চেহারা আরো মলিন হয়েছে। গ্রামের মানুষ, এই শীতের ভোরে যারা কাজে বেরিয়েছে, সবার গায়ে পর্যাপ্ত গরম কাপড় নেই। ওর মনে হলো গণতন্ত্র চাইতে গিয়ে এ মানুষগুলো যা পেয়েছে তার চেয়ে হারিয়েছে অনেক বেশি।

ছোট্ট একটা স্টেশনে ট্রেন থামার পর শীলা বললো, তখন থেকে এত কি ভাবছো শোয়েব ভাই?

শোয়েব জানে ও যা ভাবছিলো সে সব কথা বললে এরা হাসবে। শীলা রাজনীতির কথা একেবারেই পছন্দ করে না। মৃদু হেসে ও বললো, আমার ইচ্ছে করছে বিখ্যাত কোনো জায়গায় না গিয়ে এরকম একটা নাম না জানা স্টেশনে নেমে যাই। ওই যে ছোট্ট কাঠের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে ইচ্ছে করছে গিয়ে দেখি বাড়ির মানুষগুলো কেমন। নিশ্চয় খুব অবাক হয়ে যাবে আমাদের দেখলে।

শোয়েবের কথাগুলো রিনির কাছে মনে হলো সুন্দর এক স্বপ্নের মতো। দেখতে ভালো লাগে অথচ যা সত্যি হয় না। শীলা আর জনির কাছে মনে হলো পাগলের প্রলাপ। শীলা বলেই ফেললো, মাঝে মাঝে তুমি এমন অদ্ভুদ সব কথা বলো যার কোনো মানে হয় না। বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে এখানে নেমে পড়বো আর অচেনা একটা বাড়িতে ঢুকে পড়বো?

সেটাই তো আসল মজা। রিনির দিকে তাকিয়ে কথাটা খুব আস্তে বললো শোয়েব। রিনি ছাড়া ওর কথা আর কেউ শুনলো না। রিনির চোখে সমর্থন দেখে শোয়েবের ভালো লাগলো। তখনই হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন ধীরে ধীরে চলা আরম্ভ করলো।

ওরা যে কামরায় বসেছিলো সেখানে চারজনের বসার জায়গা। দরজাটা শোয়েব লক না করে সামান্য ফাঁক রেখে টেনে দিয়েছে যাতে টিকেট চেকারের ঢুকতে অসুবিধে না হয়। ট্রেন ছাড়ার মিনিট তিনেক পর দরজা ঠেলে কামরায় উঁকি দিলো শুটকো চেহারার মাঝবয়সী এক লোক। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই রিনি ওকে চিনে ফেললো। ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে দেখা মাফিয়াদের সেই চর, যে কিনা মারাওস্কির খোঁজ খবর নেয়ার জন্য ওর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলো। লোকটা ভেবেছিলো কামরায় বসার জায়গা পাবে। চারজন দেখে পরিষ্কার ইংরেজিতে সরি, বলে দরজাটা টেটে আগের জায়গায় এনে চলে গেলো। রিনির বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। শোয়েব অবাক হয়ে জানতে চাইলো–লোকটা কি তোমার পরিচিত রিনি?

এটা সেই লোক। চাপা উত্তেজিত গলায় রিনি বললো, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে যে মারাওস্কির খবর জানার জন্য আমার সঙ্গে কথা বলেছিলো। মাফিয়াদের গুপ্তচর।

জনি, তুই লক্ষ্য করিস নি?

জনি নিবিষ্ট মনে স্টিফেন কিং-এর কমিক বইটা পড়ছিলো, কাল রাতে যেটা ও শোয়েবের কাছ থেকে এনেছে। রিনির কথা শুনে ও শুধু বললো, আমার মনে নেই।

শোয়েব প্রশ্ন করলো, মাফিয়াদের গুপ্তচর এখানে কি করছে?

পরশু রয়েল প্যালেসে বুড়ো পেইন্টারটা কি বললো তোমার মনে নেই? ওকে মারাওস্কি ভেবে ভুল করেছিলো শুকনো মতো একটা লোক। তখনই আমার ডাউট হয়েছিল। এবার কনফার্ম হলাম। একটু থেমে কি যেন ভাবলো রিনি। তারপর শোয়েবকে জিজ্ঞেস করলো–লোকটাকে কি সরাসরি জিজ্ঞেস করবো, এখানে কেন এসেছে, কি চায়?

শোয়েব মাথা নাড়লো–না রিনি। সেটা ঠিক হবে না। ট্যুরিস্ট হিসেবে এখানে যে কেউ আসতে পারে। আর ও যদি সত্যিই মাফিয়ার লোক হয় তাহলে ওর পরিচয় জেনে যাওয়া কাউকে ও নিশ্চয় খাতির করবে না। ওকে তুমি চিনেছো এ কথা ভুলেও উচ্চারণ কোরো না।

শোয়েবের কথায় যুক্তি আছে। রিনি আর এ নিয়ে কথা বাড়ালো না। শুধু বললো, মারাওস্কির দেখা পেলে ওকে সতর্ক করে দিতে পারতাম। ওর কপাল মন্দ। আমাদের ঠিকানা রাখলো অথচ নিজের ঠিকানাটা দিলো না।

শোয়েব বললো, রবার্ট মারাওস্কি নামে যদি কোনো পেইন্টার ওয়ারসতে থাকে তাহলে ওর ঠিকানা বের করা কঠিন হবে না। ওয়ারস-এর সব পেইন্টারের নাম ঠিকানাওয়ালা একটা ইনডেক্সবুক আছে আমার কাছে। ওতে মারাওস্কির নাম নিশ্চয় থাকবে। এ নিয়ে তুমি ভেবো না।

তাহলে তো খুবই ভালো হয়। লোকটা আমাদের এত উপকার করলো আর ওর। এই বিপদের মধ্যে ওর জন্য কিছু করতে পারবো না ভাবতেই খারাপ লাগছে।

বিশেষ করে এ বিপদের কথা আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না।

দেখা হলে তখন সাবধান করে দিও। মৃদু হেসে বললো শোয়েব।

ভুরু কুঁচকে রিনি আর শোয়েবের কথা শুনছিলো শীলা। বললো, তোমরা কি সব মাফিয়া টাফিয়া নিয়ে বড়দের মতো কথা বলছো আমার একটুও ভালো লাগছেনা। মনে হচ্ছে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না, কোনো ক্রাইম ইনভেস্টিগেশনে যাচ্ছি।

ঠিক আছে, মাফিয়াদের কথা আর বলবো না। শীলার থুতনি নেড়ে রিনি হেসে বললো, বেড়াতে গিয়ে কি বলতে হয় তুই-ই বল।

শোয়েব ভাই একটা গান শোনাও না? আদুরে গলায় বললো শীলা।

ট্রেনের এই শব্দের ভেতর? খালি গলায়? আঁতকে উঠলো শোয়েব।

কি হয়েছে তাতে? এটা তো স্টেজ না-সামনে হাজার হাজার মানুষ বসে আছে! খালি গলাতেই গাও। শুনবো তো আমরা দুজন। জনি যেভাবে কমিকে ডুবে গেছে ওর না শুনলেও চলবে।

শোয়েবের গান অনেক অনুষ্ঠানেই শুনেছে শীলা। ওর জন্য নয়, শোয়েবের ইচ্ছে হচ্ছিলো রিনিকে গান শোনায়। অল্প কিছুক্ষণ ভাবলো কি গান গাইবে। তারপর মৃদু হেসে নরম ভরাট গলায় ও গাইলো, মনে রবে কিনা রবে আমারে।

রিনি মুগ্ধ হয়ে শোয়েবের গান শুনলো। মনে হলো ওর ভালো লাগার জন্যই বুঝি শোয়েব গাইছে। শীলা রিনিকে বললো, লায়নেল রিচির সে মি সে ইউ গানটা শোয়েব ভাই দারুণ গায়।

রিনি কোনো কথা বললো না। শোয়েবের দিকে তাকালো শুধু। রিনির চোখে অনুরোধের ভাষা বুঝতে ওর অসুবিধে হলো না। শীলার কথা মতো লায়নেল রিচিও গাইলো। গাইতে ওর ভালো লাগছিলো। ও চাইছিলো রিনি কোনো গান গাইতে বলুক। দেশে থাকতে ছায়ানটে চার বছর গান শিখেছে। পোল্যান্ডে এসে আমেরিকান ক্লাবের ভোকালিস্ট এরিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো কূটনীতিকদের এক অনুষ্ঠানে। এরিক ওকে অনেকগুলো ইংরেজি গান শিখিয়ে দিয়েছে। শোয়েবের ভালো লাগে কান্ট্রি সং আর সফট মেলোড়ি।

দিগন্ত জোড়া বরফ ঢাকা ধবধবে সাদা প্রান্তরের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। কামরার জানালা সব বন্ধ করা। হিটিং সিস্টেম থাকার কারণে সারা কামরায় নরম একটা ওম ওম ভাব। রিনিরা ফ্লাস্কে করে কফি বানিয়ে এনেছিলো। শোয়েবের দুটো গান হওয়ার পর রিনি বললো, কফি দেবো শোয়েব ভাই?

দারুণ হবে রিনি । মনে মনে এ জিনিসটাই চাইছিলাম। উচ্ছ্বসিত গলায় বললো শোয়েব।

কাগজের গ্লাসে তিন কাপ কফি ঢাললো রিনি । জনি কফি বেশি পছন্দ করে না। ওকে অরেঞ্জ জুসের একটা ফয়েল প্যাকেট বের করে দিলো। কফি শেষ করে শোয়েব একটু ইতস্তত করে বললো, রিনি, তুমি যদি আপত্তি না করো আর শীলা যদি মাকে না বলে দেয়–আমার একটা সিগারেট খেতে খুব ইচ্ছে করছে।

তুমি সিগারেট খাবে? চোখ কপালে তুলে বললো শীলা।

শোয়েব একটু গম্ভীর হয়ে বললো, শীলা, আমার বয়স এখন উনিশ। আমাদের ক্লাসের বেশির ভাগ ছেলে মেয়েই সিগারেট খায়।

রিনি বললো, বাবা বলেছেন আঠারো বছর বয়স হলে আমরা ওয়াইনও খেতে পারি। শীলা কেন মিছেমিছি বলতে যাবে।

শোয়েব লাজুক হেসে জ্যাকেটের ভেতর থেকে মার্লবোরো লাইট বের করে ধরালো। ধোয়া ছাড়লো আনাড়ির মতো। বোঝাই যায় সিগারেট ধরেছে বেশি দিন হয় নি।

ক্র্যাকভ পৌঁছতে পৌঁছতে নটা বেজে গেলো, কথা ছিলো সাড়ে আটটায় পৌঁছানোর। মাঝখানে কয়েকটা স্টেশনে বেশিক্ষণ থামতে হয়েছিলো।

চারটা ছোট হাতব্যাগ নিয়ে ওরা চারজন ঝটপট ট্রেন থেকে নামলো ক্রাকভ স্টেশনে। সঙ্গে সঙ্গে হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন চলে গেলো। শোয়েব বললো, আমরা এখন যাবো হোটেল অরবিস-এ। ওখানে আমাদের রুম বুক করা আছে।

স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াতেই ট্যাক্সিওয়ালারা ওদের ঘিরে ধরলো। শোয়েব ওদের পোলিশ ভাষায় কিছু যেন বললো। ওরা চলে গেলো কেন শোয়েব ভাই?

আমাদের ট্যাক্সির দরকার নেই। জবাব দিলো শোয়েব। ওল্ড সিটিতে হেঁটে যাবো। দশ মিনিট লাগবে। তাছাড়া ওখানে ট্যাক্সি এমনিতেও যাবে না।

যে যার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে স্টেশনের বাইরের প্রশস্ত চত্বরটুকু পেরোতেই রিনির চোখে পড়লো–মাফিয়াদের সেই ইঁদুরমুখো গুপ্তচরটা। এক ট্যাক্সিওয়ালার পেছন পেছন বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে বাইরে ভিড়ের ভেতর হারিয়ে গেলো।

৫-৬. মাফিয়া বনাম মারাওস্কি

০৫. মাফিয়া বনাম মারাওস্কি

ক্র্যাকভের পুরোনো শহরের পুরোটাই জাদুঘর। ওয়ারসতে জাদুঘর দেখে তাচ্ছিল্য দেখিয়েছিলো জনি। ক্র্যাকভের ঘরবাড়ি দেখে ও হতবাক। বার বার বলছিলো, সত্যি বলছো শোয়েব ভাই? এদের ইউনিভার্সিটি ইউরোপের সবচেয়ে পুরোনো? কিংবা এই বাজারটা ছশ বছর ধরে একরকম আছে?

হোটেলে জিনিসপত্র রেখে ওরা ব্যাটারি কার–এ ঘুরতে বেরিয়েছে। ভারি মজার গাড়ি। বড় সড় খেলনার মতো দেখতে হালকা গড়নের, তেল লাগে না, ব্যাটারিতে চলে, কোনো শব্দ হয় না। পুরোনো শহরের রাস্তা জখম হবে বলে সাধারণ গাড়ি ঢুকতে দেয়া হয় না। ঘন্টা হিসেবে গাড়ি ভাড়া করেছিলো শোয়েব। প্রতি ঘন্টা পঁচিশ হাজার ফুলটি। পোলিশরা ওদের টাকাকে বলে যলটি। পঁচিশ হাজার শুনে আঁতকে উঠেছিলো জনি। শীলা হেসে বললো, পঁচিশ হাজার মানে তোমাদের দু পাউন্ডেরও কম।

শুনে আরও অবাক হলো জনি–এত সস্তা।

গাড়ি চালাচ্ছিলো জনির সমবয়সী পেজেক। চালাতে চালাতে গড়গড় করে ইংরেজিতে বলে যাচ্ছিলো দু পাশের ঘরবাড়ির বিবরণ। কোন বাড়ির ভেতরে কি আছে, কোন দুর্গে কটা কামরা আছে, সবই পেজেকের নখদপর্ণে। জাগিয়েললিয়ন ইউনিভার্সিটির পুরোনো ইমারত দেখিয়ে পেজেক অভিজ্ঞ গাইডের মতো বললো, তেরশ চোষট্টি সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ইউরোপের সবচেয়ে পুরোনো পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাসের নাম আশা করি জানা আছে। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

বিস্তা নদীর তীরে পাহাড়ের ওপর ওয়োভেল দুর্গ আরেক দর্শনীয় স্থান। কিছুটা পথ গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। বাকিটুকু হেঁটে যেতে হবে। পেজেক বললো, দুর্গটার ভেতরে দেখতে যাবে নাকি?

একশ বার যাবো। রিনি জনি দুজনই সমান উত্তেজিত। রিনির আকর্ষণ পুরোনো পেইন্টিং আর এন্টিকস্ । জনির ধারণা এসব পুরোনো দুর্গে নিশ্চয় সেই সময়ের কোনো অতৃপ্ত আত্মার দেখা পাওয়া যাবে। আগেকার দিনের কাউন্ট আর ব্যারনরা তো কম দুষ্কর্ম করে নি।

শোয়েব আর শীলা ওয়াভেল দুর্গে আগেও এসেছিলো। শীলার ভেতর কোনো উচ্ছ্বাস না থাকলেও শোয়েবের ভালো লাগছিলো সবার গার্জেন হয়ে ঘুরে বেড়াত।

পেজেক বহুবার এসেছে বলেই সব গড় গড় করে বলে যাচ্ছিলো। সারা পৃথিবীতে এরকম রাজকীয় দুর্গ মাত্র আটটি আছে। সবচেয়ে পুরোনো বলেই পোল্যান্ডে এর গুরুত্ব বেশি। বিশাল এলাকা জুড়ে পাঁচশ বছরের পুরোনো দুর্গ।

শীলা ভেতরে ঢোকে নি। রিনিদের বলেছে, তোমরা ঘুরে এসো। আমি অপেক্ষা করছি।

দুর্গের বাইরের চত্বরে ছোট ছোট ফেরিওয়ালা নানারকম সুভেনির বিক্রি করছিলো। শীলা জনির জন্য কয়েকটা ছোট খাট সুভেনির কিনে ও ফেরিওয়ালার কাছ থেকে এক কাপ কফি নিয়ে বুড়ো ওক

গাছটার নিচে বসলো। গ্রাম থেকে আসা ছেলে মেয়েরা একা ওকে বসে বসে কফি খেতে দেখে অবাক হচ্ছিলো, শীলাও মজা পাচ্ছিলো।

অনেকগুলো ঘর ঘুরে পেইন্টিং-এর চেম্বারে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো রিনি । শোয়েব বলতে যাচ্ছিলো–কি হলো? রিনি ইশারায় ওকে থামিয়ে দিলো।

লম্বা চেম্বারের চার দেয়ালে পাঁচ ছশ বছরের পুরোনো সব নানা আকারের পেইন্টিং ঝোলানো। ঘরে মাত্র একজন লোক চোখের সামনে আতস কাঁচ ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পেইন্টিং দেখছে। লোকটা আর কেউ নয়, মাফিয়াদের সেই গুপ্তচর, রিনি যাকে সকালে ওদের ট্রেনের কামরায় উঁকি মারতে দেখেছিলো।

চাপা গলায় রিনি বললো, মাফিয়াদের সেই লোকটা!

রহস্যের গন্ধ পেয়ে জনির রোমাঞ্চ হলো। পেজেক কিছু বুঝতে পারলো না। শোয়েব ওর কানে কানে বললো, এই লোকটা ভালো নয়। আমরা আড়াল থেকে দেখতে চাই ও কি করে।

নিশ্চয় পেইন্টিং চুরি করবে, তাই না আপু? খুশি আর উত্তেজনা উপচে পড়ছিলো জনির গলা থেকে। অতৃপ্ত আত্মার দেখা না পেলেও জলজ্যান্ত একজন চোরের দেখা পেয়েছে এবং ওদের চোখের সামনে চুরির পর্বটি সমাধা হবে–ওর জন্য এটাও কম রোমাঞ্চকর নয়।

রিনি কোনো কথা না বলে শোয়েবদের নিয়ে পা টিপে টিপে হেঁটে বড় জানালার পর্দার আড়ালে লুকোলো। মাফিয়াদের গুপ্তচর ছবি পর্যবেক্ষণের কাজে এমনই ব্যস্ত ছিলো যে, অন্য কোনো কিছুর ওপর ওর নজর ছিলো না।

সেদিন কোনো ছুটির দিন ছিলো না। তাছাড়া এটা ট্যুরিস্টদেরও আসার সময় নয়। গ্রাম থেকে আসা দর্শনার্থীরা রাজাদের ধনরত্ন আর যুদ্ধের সাজসজ্জা দেখতেই বেশি আগ্রহী। যে কারণে এদিকটা ছিলো একবারেই ফাঁকা। দুর্গের গার্ডদেরও সাধারণত যেখানে দর্শনার্থীর ভিড় বেশি সেখানে থাকতে হয়। ট্রেজারি চেম্বারে গোটা ছয়েক গার্ড লক্ষ্য করেছে শোয়েব। ওর আর রিনির মনে হলো পেইন্টিং চোর সব কিছু হিসেব করেই এসেছে। বড় পেইন্টিং নিতে পারবে না। তবে দেয়ালে ছোট ছোট অনেক পেইন্টিং রয়েছে। রিনি জানে অনেক মিনিয়েচার পেইন্টিং-এর দাম বড়গুলোর চেয়েও বেশি।

অনেকক্ষণ ধরে মাফিয়াদের গুপ্তচরটা ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। জনি রীতিমতো অধৈর্য হয়ে উঠেছিলো–চুরি করতে কি এত সময় লাগে। যে কোনো সময় গার্ড এসে যেতে পারে। তখন কি আর চোর ধরার কৃতিত্ব ওরা নিতে পারবে? চোরটা হাঁদা নাকি! শোয়েব আর রিনিও কম অবাক হয় নি। চুরি

ছাড়া লোকটার কি অন্য কোনো মতলব আছে? পেজেকও জনির মতো উত্তেজিত হয়ে লোকটার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো।

কয়েকটা পেইন্টিং ভালোভাবে লক্ষ্য করে লোকটা একটা মাঝারি আকারের ছবির সামনে দাঁড়ালো। তারপর পকেট থেকে নোটবই আর পেন্সিল বের করে ওটা কপি করতে লাগলো যেভাবে আর্ট স্কুলের ছাত্ররা করে। যে কোনো পুরোনো মিউজিয়ামে এরকম দৃশ্য দেখা যায়, কিন্ত এই আধবুড়ো লোকটা নিশ্চয় আর্ট স্কুলের ছাত্র নয়। রিনি অবাক চোখে শোয়েবের দিকে তাকালো।

লোকটার মতলব বুঝতে শোয়েবের এতটুকু অসুবিধে হলো না। রিনি আর জনির হাত ধরে ওখান থেকে সরে এলো পাশের চেম্বারে। পেজেকও এলো ওদের পেছন পেছন। চাপা উত্তেজিত গলায় শোয়েব বললেন, রিনি ঠিকই ধরেছে, লোকটা খুবই পেশাদার পেইন্টিং চোর।

জনি একটু তাচ্ছিল্যের গলায় বললো, পেশাদাররা বুঝি চুরির সুযোগ পেয়েও আর্ট স্কুলের ছাত্রদের মতো পেইন্টিং কপি করে। চোরের ওপর হতাশ হয়ে বিরক্তিটা ও শোয়েবের ওপর ঝাড়লো।

শান্ত গলায় শোয়েব বললো, হাউ টু স্টিল এ মিলিয়ন ছবিটা বোধহয় জনি দেখো নি। ওটা দেখলে বুঝতে পারতে পেইন্টিং চুরি খুব সহজ কাজ নয়।

শোয়েবের সঙ্গে জনির ওভাবে কথা বলা রিনির মোটেই ভালো লাগে নি। অধৈর্য হয়ে জানতে চাইরো, কি ছিলো ছবিতে?

বিখ্যাত কোনো পেইন্টিং ঘরে বসে এরা কপি করে। হুবহু একরকম করে আঁকে। একরকম সাইজে একইরকম করে বাঁধায়। তারপর গার্ডদের কাউকে হাত করে আসল পেইন্টিংটা সরিয়ে নকলটা ওখানে ঝুলিয়ে দেয়। এক্সপার্ট ছাড়া কেউ টেরও পাবে না কোনটা আসল আর কোনটা নকল। ধরা পড়তে বহুদিন লাগে। এর ফাঁকে আসল পেইন্টিং অন্য কোনো দেশে পাচার হয়ে যায়।

শোয়েবের কথায় যুক্তি আছে। তবু জনি বললো, চার পাঁচ শ বছরের পুরোনো সব পেইন্টিং-এর ভেতর নতুন আঁকা একটা পেইন্টিং থাকলে আমিও ধরে ফেলতে পারবো, ওর জন্য এক্সপার্ট লাগবে না। শোয়েবের দেখা ছবিটা না দেখলেও ক্রাইম ছবি জনিও কম দেখে নি।

তুমি সব জানো আর যারা পেশাদার চোর তারা জানে না, এমন ভাবছো কেন? শোয়েবের গলায় সামান্য বিদ্রূপ–ওরা একটা ছবি আঁকার পর এমন সব কেমিকেলে ওটা ডুবিয়ে রাখে যাতে মনে হয় ক্যানভাসটা কয়েক শ বছরের পুরোনো। রঙ বেশি পুরু থাকলে একটু ফাটা ফাটা মতো হয়ে যায়, চকচকে ভাবটাও থাকে না।

আমরা এখন কি করবো? উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলো রিনি ।

আমরা ওকে ফলো করে ওর স্টুডিওতে যাবো। ওখানে বসে নিশ্চয় ও অরিজিনালটার মতো ছবি আঁকছে। যদি দেখি আমার ধারনা ঠিক, তাহলে পুলিসকে জানাবো।

শোয়েবের কথায় রোমাঞ্চকর কিছু করার আভাস পেয়ে জনি উৎফুল্ল হয়ে বললো, তাহলে আর দাঁড়িয়ে আছি কেন, চলো।

পেজেকের বোঝার সুবিধের জন্য ওরা কথা বলছিলো ইংরেজিতে। জনির মতো পেজেকও রোমাঞ্চিত হলো জাদরেল একটা চোরকে হাতে নাতে ধরার সুযোগ পাচ্ছে। বলে। রিনি মুগ্ধ হলো শোয়েবের ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে।

আগের মতো পা টিপে টিপে উত্তেজিত চারজন পেইন্টিং চেম্বারের দরজার সামনে এসে হতভম্ব হয়ে গেলো। সারা ঘর খালি, মাফিয়াদের লোকটা পালিয়েছে। শোয়েব বললো, এখনো নিশ্চয় দুর্গ থেকে বেরোয় নি। পা চালিয়ে এসো, এখান থেকে বেরোবার আগেই ওকে ধরে ফেলবো।

পেজেক ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো। ওয়াভেল দুর্গে কামরার অন্ত নেই। পেজেকের মতে গাইড না থাকলে ওরা এত অনায়াসে ঘরের পরে ঘর পেরিয়ে ছুটতে পারতো না। দ্রুত হাঁটতে গিয়ে রিনি একবার কিসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে শোয়েব ওকে শক্ত হাতে ধরে ফেললো। জনি বিরক্ত হয়ে ধমক লাগালো-তুই কি রে আপু! দেখে শুনে চলতে পারিস না?

রিনি শোয়েবকে ধন্যবাদ বলতে গিয়ে অকারণে লাল হলো।

দ্রুত পায়ে হেঁটে দুর্গের বাইরে এসেও চোরের কোনো সন্ধান পেলো না ওরা। শীলা তখন ওক গাছের তলায় কাঠের বেঞ্চে বসে গ্রাম থেকে আসা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করছিলো। রিনিদের হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে অবাক হয়ে ও উঠে এলো। রিনিকে বললো, এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে! কি খুঁজছো, টয়লেট?

আরে না! ব্যস্ত গলায় রিনি জানতে চাইলো, এ পথ দিয়ে একটু আগে রোগা মতো টেকো, চশমা পরা লোককে যেতে দেখেছো? গায়ে কালো ওভারকোট।

জনি বললো, চোরের মতো দেখতে?

শীলা অবাক হয়ে বললো, না তো! দশ মিনিটের ভেতর চোর ভালোমানুষ কাউকে বেরোতে দেখি নি। কেন, তোমাদের কিছু চুরি করেছে নাকি?

করে নি এখনও। তবে করবে। ভারিক্কি গলায় জবাব দিলো জনি।

করবে মানে? কি চুরি করবে?

পেইন্টিং! রহস্যভরা গলায় বললো জনি।

কি করে জানলে ও পেইন্টিং চুরি করবে?

আড়চোখে একবার শোয়েবকে দেখে জনি শুধু বললো, জানি।

শোয়েব আর রিনির কাছে শীলা জনির ফালতু কথা মোটেই ভালো লাগছিলো না। মাফিয়াদের একটা চর–যে কি না পেইন্টিং চুরির মতলবে এদেশে এসেছে–হাতের কাছে পেয়েও ধরা গেলো না, এটা কম দুঃখের নয়। রিনি শোয়েবকে জিজ্ঞেস করলো, এবার আমরা কি করবো? পুলিস স্টেশনে যাবে?

শোয়েব শুকনো হেসে বললো, আমরা কি প্রমাণ করতে পারবো নোকটা চুরির উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে?

না, তা পারবো না।

সেক্ষেত্রে পুলিস আমাদের কথা শুনবে না।

শীলার কাছে এদের কথাবার্তা সব দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিলো। একটু বিরক্ত হয়ে বললো, তোমরা কেউ কি আমাকে দয়া করে বলবে দুর্গের ভেতর কি ঘটেছে?

তেমন কিছু ঘটে নি, তবে ঘটতে পারে। এই বলে শোয়েব ওকে সব খুলে বললো।

এরকম একটা উত্তেজনাকর কাহিনী শোনার পরও শীলার বিরক্তি গেলো না। বললো, আচ্ছা আমরা কি এখানে বেড়াতে এসেছি, না কোথাকার কোন মাফিয়া না কে, তার পেছনে ঘুরে মরবো?

শোয়েব বললো, আমি হার মানছি শীলা। আমরা দুদিনের জন্য বেড়াতেই বেরিয়েছি।

তাহলে আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না। জাহান্নামে যাক মাফিয়া আর পেইন্টিং চোর। এখন খিদে পেয়েছ, আগে খাবে। তারপর আমরা মার্কেট স্কয়ারে যাবো শপিং করতে।

শীলার রায় শুনে শোয়েব মৃদু হাসলো–ঠিক আছে শীলা। আমরা মার্কেট স্কয়ারেই খেতে যেতে পারি।

পুরোনো শহরের ঠিক বুকের মাঝখানে মার্কেট স্কয়ার। লম্বা, উঁচু ব্যারাকের মতো পুরোনো আমলের ইমারতের ভেতর ছোট ছোট খোপে বিচিত্র সব হস্তশিল্পের পসরা সাজিয়ে বসেছে কারিগররা। চমৎকার সব ঘর সাজাবার জিনিষপত্র, নাম শুনে রিনি জনি দুজনই অবাক হলো। লণ্ডনের বাজারে এসবের দাম কম করে হলেও দশগুণ হবে। জমকালো পোষাক পরা নানা বয়সী পুতুল থেকে শুরু করে পা রাখার ছোট কার্পেট পর্যন্ত কিনে ব্যাগ বোঝাই করে ফেললো রিনিরা। দুপুরের খাওয়াও

সারলো পুরোনো এক রেস্তোরাঁয় পোলিশ খাবার দিয়ে। বিটের সুপটা দারুণ লাগলো রিনির। অন্য সব পদও মন্দ ছিলো না।

পেজেক ওদের সঙ্গে খেতে বসে বেজায় খুশি। দুবছর ধরে ও ব্যাটারি কার চালাচ্ছে, আজ পর্যন্ত কেউ ওকে এরকম দামী রেস্তোরাঁয় খাওয়ায় নি। বড়জোর একটা আইসক্রিম না হয় এক কাপ কফি খেতে দিয়েছে। বাংলাদেশের এই হাসিখুশি চারটি ছেলে মেয়ের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতায় ওর বুক ভরে গেলো।

আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? মার্কেট স্কয়ারের বিশাল চত্বরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো শীলা।

রিনিরা যেখানে যেতে চায়। মুখ টিপে হেসে রিনির দিকে তাকালো শোয়েব।

বারে, আমি কি করে জানবো কোথায় কি আছে? বলতে গিয়ে অকারণেই রিনির কানের ডগা লাল হলো।

পেজেক বললো, তোমরা ইচ্ছে করলে জার্টোরিস্কি মিউজিয়াম দেখতে পারো। পোল্যাণ্ডের সবচেয়ে পুরোনো জাদুঘর এটা।

জনি বললো, তোমাদের এখানে কোন জিনিসটা পোল্যান্ডের সবচেয়ে পুরোনো নয় বলতো।

আপাতত নিজেকে ছাড়া আর কিছু দেখছি না। এই বলে লাজুক হাসলো পেজেক–তবে আমাদের বংশ খুব পুরোনো।

রিনি বললো, ঠিক আছে পেজেক। আমরা তোমাদের সবচেয়ে পুরোনো জাদুঘর দেখবো।

শীলা বললো, যত পুরানোই হোক, তোমরা বৃটিশ মিউজিয়াম দেখেছো। ওর তুলনায় এসব মিউজিয়াম কিছুই না।

রিনি জনি প্রথমে তাই ভেবেছিলো। পেজেকের আগ্রহ দেখেই রিনি ওর কথায় সায় দিয়েছিল। প্রথম দেখাতেই জনির কাছাকাছি বয়সের ছেলেটার ওপর ওর মায়া পড়ে গিয়েছিল। এখনো স্কুলের গণ্ডি পেরোয় নি, বাবার আয়ে সংসার চলে না বলে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে চাকরি করছে শুনে ওকে ভালো লেগে গেছে রিনির।

জার্টোরিস্কি জাদুঘরের গ্যালারিতে ঢুকে রিনি অবাক হয়ে গেলো দ্য ভিঞ্চির অরিজিনাল পেইন্টিং দেখে। দ্য লেডি উইথ অ্যান এরমাইল-এর সামনে দাঁড়িয়ে রইলো হতবিহ্বল হয়ে। পেজেক বললো এখানে রাফায়েলের কিছু দুর্লভ ছবি ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজীরা চুরি করে নিয়ে গেছে।

রিনি বললো, রাফায়েলের ছবি ওয়ারসর রয়েল ক্যাসেলে দেখেছি।

জাদুঘর দেখা শেষ করে পাথর বাঁধানো সরু রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শোয়েব পেজেককে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি বলতে পারবে গত কয়েক মাসে ক্র্যাকভের কোনো মিউজিয়াম বা ক্যাসেল থেকে কোনো কিছু চুরি গেছে কি না?

মনে হয় না। একটু ভেবে জবাব দিলো পেজেক–মূল্যবান কিছু চুরি হলে নিশ্চয় খবরের কাগজে দেখতে পেতাম।

গত বছর আন্দোলনের সময়ও নয়?

না, গত বছরও কিছু শুনি নি। তাছাড়া এখানে ওয়ারস বা গৃড়ানস্কের মতো কোন আন্দোলনও হয় নি।

শীলা গম্ভীর গলায় শোয়েবকে বললো, নিশ্চয় তোমার মাথায় ওসব মাফিয়াদের ভূত চেপেছে?

শোয়েব হেসে ফেললো, দুঃখিত শীলা! আসলে ভূতটা খুব পাজি। কিছুতেই তাড়াতে পারছি না।

রিনি নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি ভাবছো?

আমার মনে হয় খুব শিগগিরই ওয়াভেল ক্যাসেলের পুরোনো কিছু ছবি চুরি হবে।

রহস্যের গন্ধ পেয়ে জনি উত্তেজিত হয়ে বললো, তুমি এতটা শিওর হলে কিভাবে?

কিছু কিছু জিনিস আছে আমি আগে থাকতে বুঝতে পারি।

ইএসপি। বিস্মিত গলায় একরকম চেঁচিয়ে উঠলো জনি–সত্যি বলছো শোয়েব ভাই, তোমার ইএসপি আছে?

আরে না। ই এস পি কোথায় পাবো। ঘটনার গতি দেখে অনুমান করতে পারি।বিব্রত গলায় শোয়েব বললো, আমার অনুমান ভুলও হতে পারে।

কিভাবে অনুমান করলে বলো না? অধৈর্য হয়ে উঠলো জনি।

আমার মনে হচ্ছে তোমাদের মারাওস্কিও খুব সম্ভব ক্র্যাকভ এসেছে।

আহা, হেঁয়ালি না করে খুলে বলবে তো? শীলার মনে হলো এর একটা মীমাংসা হওয়া দরকার।

রয়েল প্যালেসে যাকে আমরা মারাওস্কি ভেবেছিলাম সে আসলেই মারাওস্কি।

না, না, মারাওস্কি অতো বুড়ো নয়। প্রতিবাদ করলো রিনি ।

যারা নাটক করে চামড়ায় ভাঁজ ফেলার জন্য তারা এক ধরনের স্প্রে ব্যবহার করে।

ওই স্প্রে দিয়ে যে কারো বয়স পনেরো কুড়ি বছর বাড়িয়ে নেয়া যায়।

মারাওস্কির গলাও ওরকম মেয়েলি নয়। এবার প্রতিবাদ করলো জনি।

শোন জনি, নাটকে যারা অভিনয় করে তারা গলার আওয়াজও ইচ্ছে মতো বদলাতে পারে।

তুমি কি বলতে চাইছো? এবার শীলাও কৌতূহলী হলো।

কাল আমি মারাওস্কির পরিচয় জানার জন্য আর্টিস্টস ইনডেক্সটা দেখছিলাম। পেইন্টারদের তালিকায় আমি রবার্ট মারাওস্কির নাম না পেলেও অভিনেতাদের তালিকায় পেয়েছি। ও বেশ নাম করা অপেরা আর্টিস্ট। অপেরায় ইন্টারেস্ট নেই বলে ওর নাম শুনি নি। তবে ইনডেক্সে দেখলাম ও বেশ নাম করা শিল্পী। ওর ছবিও ওতে ছাপা হয়েছে। চেহারার মিলটা আমারও চোখে পড়েছে। জমজ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই কারণ ও বাপের এক ছেলে।

জনি বললো, তার মানে তুমি বলতে চাইছে রয়েল প্যালেসে মারাওস্কি ছদ্মবেশে গিয়েছিলো?

ঠিক ধরেছো। মৃদু হেসে জবাব দিলো শোয়েব।

কিন্তু কেন? চাপা উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলো রিনি।

মাফিয়াদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। সহজ গলায় বললো শোয়েব।

তাই যদি হবে, জনি বললো, রয়েল প্যালেসের ভিড়ের মধ্যে বসে না থেকে ও নিজের পরিচিত কারো বাড়িতে লুকিয়ে থাকলেই তো পারে।

মনে হচ্ছে লোকটার দেশপ্রেম খুব বেশি। নিজের জীবনের চেয়ে রয়েল প্যালেসের পেইন্টিং পাহারা দেয়া বেশি জরুরী মনে করছে সে। রিনিদের তো বলেছে এক সময় যে সে ওখানকার কিউরেটার ছিলো।

কাল যে লোকটা রয়েল প্যালেসে ছিলো, আজ হঠাৎ ক্র্যাকভ আসবে কেন? শোয়েবের বিশ্লেষণ জনির ঠিক মনঃপুত হচ্ছিলো না।

হয়তো কোনো সূত্রে খবর পেয়েছে মাফিয়াদের নজর ক্র্যাকভের ওপরও পড়েছে। এমনও তো হতে পারে–মারাওস্কি গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে জড়িত। পোল্যান্ডের বাইরে মাফিয়ারা ওর ওপর নজর রেখেছিলো। এখানে ও নজর রাখছে মাফিয়াদের তৎপরতার ওপর।

শোয়েবের কথায় যুক্তি আছে এটা বুঝতে রিনির অসুবিধে হলো না। ওর কথার সামান্য সূত্র ধরে শোয়েব এত কিছু ভেবেছে দেখে মনে মনে ও মুগ্ধ না হয়ে পারলো না।

.

০৬. মাফিয়াদের হাতে বন্দী

শোয়েবের ধারণা যে মিথ্যে ছিলো না, দিন ফুরোবার আগেই তার প্রমাণ পেয়ে গেলো রিনিরা। শেষ বিকেলে ওরা বসেছিলো বিস্তা নদীর তীরে। জায়গাটা ছিলো বাঁধানো চত্বরের মতো। গ্রাম থেকে আসা

কয়েকজন বুড়ি আর গোটা দুই জিপসি পরিবার নানা ধরনের হাতের কাজের জিনিস ঝুড়িতে আর সাইকেল ভ্যানে সাজিয়ে বিক্রি করছিলো সেখানে। পর্যটকদের আসার সময় না হলেও কিছু দর্শনার্থী ভিড় জমিয়েছিলো প্রকৃতির শোভা দেখার জন্য।

মস্তবড় একটা কাপড়ের ছাতার নিচে বসে রিনি, জনি, শোয়েব আর শীলা কফি খাচ্ছিলো। একটু আগে পেজেক ওর গাড়ি জমা দিতে গেছে। দিনটা ওর দারুণ কেটেছে। আট ঘন্টা ডিউটি করে দু লাখ য়ুলটি পেয়েছে ও। দু লাখের ভেতর ও পাবে বিশ হাজার ফুলজি বাকিটা কোম্পানির। গত কয়েক মাসের ভেতর কোনো দিন এত বেশি আয় হয় নি ওর। তার ওপর বাংলাদেশের চমৎকার ছেলেমেয়েরা ওকে দুপুরে দামী রেস্তোরাঁয় খাইয়েছে। বিকেলে কেনাকাটা করার সময় পরির মতো সুন্দর মেয়েটা ওর মায়ের জন্য উলের একটা চমৎকার স্কার্ফ কিনে দিয়েছে। এত ভালো টুরিস্ট ওর জীবনেও দেখে নি পেজেক। ওরা বলেছে গাড়ি জমা দিয়েই চলে আসতে। রাতেও নাকি ওদের সঙ্গে খেতে হবে।

রিনি জনিদেরও ভালো লেগেছে পেজেককে। মাত্র ক্লাস নাইনে পড়ে। এই বয়সের একটি ফুটফুটে কিশোর সংসারের কথা ভাবে, যখন কিনা তার খেলার সময় তখন সে আয়ের জন্য রাস্তায় নেমেছে, তাকে ভালো না বেসে পারা যায় না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে ওর বাড়ির অনেক খবরই জেনেছে রিনি।

ছন্নছাড়া একটা মেপল গাছের নিচে বসে কফির কাপে চুমুক দিতে জনি বললো, আমার ইচ্ছে করছে পেজেককে আমাদের সঙ্গে ওয়ারস নিয়ে যাই।

শীলা বললো, তোমার সঙ্গে ওয়ারস ঘুরে বেড়ানোর অবস্থা বুঝি ওর আছে! দেখছো না সারা দিন কাজ করতে হয় ওকে?

তাতে কি জনি বললো, আমরা ওকে দিনে দু পাউন্ড করে দেবো। ও সারাদিনে নিশ্চয় এত কামায় না।

শোয়েব বললো, আমার মনে হয় না এভাবে ও তোমার কাছ থেকে সাহায্য নেবে। ওর আত্মমর্যাদা বোধ খুব টনটনে।

বারে, বন্ধু ভেবে উপহার দেবো তাও নেবে না?

মনে হয় না। দেখোনি রিনি ওর মার জন্য স্কার্ফ কিনে কিরকম বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলো?

আমরা যদি ওকে গাইড হিসেবে হায়ার করি?

শোয়েব কি যেন বলতে যাবে তক্ষুণি রিনি চাপা উত্তেজিত গলায় বললো, শোয়েব এদিকে দেখো! রবার্ট মারাওস্কি বেরোচ্ছেন ক্যাসেলের ভেতর থেকে।

রিনির কথা শুনে ওরা চমকে উঠে তাকালো দূরে ক্যামেলের রাস্তার দিকে। তখনও সন্ধ্যা হয় নি। ওরা দেখলো লম্বা লম্বা পা ফেলে মারাওস্কি শহরের দিকে যাচ্ছেন। চলার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিলো খুব তাড়া আছে ওঁর। রিনি আবার বললো, তুমি ঠিকই বলেছিলে শোয়েব। মাফিয়াদের খবর তিনিও পেয়ে গেছেন।

জনি আর শীলা এতই উত্তেজিত ছিলো যে ওরা লক্ষ্যই করলো না রিনি শোয়েবকে ভাই না বলে শুধু নাম ধরে ডাকছে। শোয়েব সকাল থেকে ভাবছিলো রিনিকে এক ফাঁকে বলবে ওকে ভাই না ডেকে শুধু নাম ধরে ডাকতে। জনি শীলা লক্ষ্য না করলেও প্রথমবার শোয়েব ভেবেছিলো ও বুঝি ভুল শুনছে। পরের বার শোনার পর ওর বুকের ভেতরটা আনন্দ আর উত্তেজনায় শির শির করে কেঁপে উঠলো। রিনিকে ওর বলতে ইচ্ছে করলো, জাহান্নামে যাক মাফিয়ারা, এসো আমরা এখানে বসে নদীতে সূর্য ডোবা দেখি। একটু পরেই আকাশে চাঁদ উঠবে।

জনি বললো, আমরা ওকে ফলো করতে পারি না আপু,? ওকে একা পেয়ে মাফিয়ারা যদি বিপদে ফেলে?

ঠিক বলেছিস জনি। রিনি আগের মতো উত্তেজিত গলায় বললো, মারাওস্কি চাচা আমাদের কম উপকার করে নি। ওর যাতে কোনো বিপদ না হয় আমাদের দেখা দরকার।

রিনিকে খুশি করার জন্য শোয়েব উঠে দাঁড়ালো–তাহলে আর বসে আছি কেন? চলো ওকে ফলো করি।

শীলা বললো, পেজেক এসে যে ফিরে যাবে।

রিনি ওর হাত ধরে টানলো–পেজেককে আমরা কাল সকালে ওর জায়গায় পেয়ে যাবো। দেরি না করে চলো। নইলে মারাওস্কিকে আমরা হারিয়ে ফেলবো।

রাস্তায় উঠে কিছুটা দূরত্ব রেখে ওরা রবার্ট মারাওস্কিকে অনুসরণ করলো। রিনির একটু খটকা লাগলো মারাওস্কিকে মেকাপ ছাড়া দেখে। মাফিয়াদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য বেশি বুড়ো সেজে রয়েল ক্যাসেলে বসেছিলেন অথচ এখানে দিব্যি দিনের আলোয় ঘুরছেন কোনো ছদ্মবেশ ছাড়াই। কথাটা শোয়েবকে বলতে সেও চিন্তিত হলো। বললো, তবে কি মারাওস্কি জানেন না মাফিয়াদের লোক যে এখানে এসে গেছে?

মারাওস্কি চাচা না জানলেও মাফিয়ারা জানে। এই বলে জনি উত্তেজিত হয়ে আঙুল তুলে দেখালো–ওই দেখো, মাফিয়াদের হেলথ মিনিস্টার ঠিকই তাকে ফলো করছে।

শুকনো কাঠির মতো দেখতে বলে জনি ওর নাম দিয়েছে হেলথ মিনিস্টার অব মাফিয়াজ কিংডম। এমনই শুটকো যে রাস্তায় লোকজনের ভেতর ওকে প্রথমে ওরা দেখতে পায় নি ওরা বেশ খানিকটা দূর থেকে অনুসরন করছিলো মারাওস্কিকে।

শোয়েব চাপা গলায় বললো, মাফিয়া শয়তানটাকে আর হাতছাড়া করা চলবে না। আজই ওকে হাজতে পোরার ব্যবস্থা করবো।

জনি বললো, আমরা যদি সত্যি সত্যি মাফিয়াদের একটা এজেন্টকে চোরাই মাল হাতে ধরতে পারি দারুণ ব্যাপার হবে।

সেক্ষেত্রে আমাদের যেতে হবে ওদের আসল ঠিকানায়। জনির কথায় সায় জানালো রিনি।

শীলা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললো, মাফিয়াদের পেছনে লাগতে গিয়ে আমরা যদি কোনো বিপদে পড়ি।

এই শুঁটকিটাকে একা আমিই সামলাতে পারবো। সহজ গলায় বললো শোয়েব।

মারাওস্কি আর মাফিয়ার চরটাকে অনুসরণ করে জাদুঘরের কাছাকাছি আসতেই উল্টো দিক থেকে আসা এক দঙ্গল জিপসির মুখোমুখি হলো ওরা। নদীর ধারে জিপসিরা তাবু ফেলেছে। পেজেক বলছিলো দুদিন পরই নাকি নদীর ধারে ওদের বিরাট মেলা বসবে। ডিসেম্বরের পূর্ণিমাতে প্রতিবছর এখানে জিপসিদের মেলা বসে। বেড়াল, কুকুর, ঘোড়া থেকে শুরু করে ফুলতোলা রুমাল পর্যন্ত সব পাওয়া যাবে ওখানে। গাছের ছালবাকল দিয়ে নানারকম ওষুধও বানিয়ে বিক্রি করে ওরা।

জিপসিদের একটা পাজি মেয়ে শোয়েবকে দেখে চোখ টিপে শিস দিলো। মেয়েটার অসভ্যতায় ভারি রাগ হলো রিনির। হঠাৎ করে এমন একটা কাণ্ড ঘটায় শোয়েবও থতমত খেলো। আর ঠিক তখনই ওদের চোখের সামনে থেকে মাফিয়াদের চরটা কর্পূরের মতো উবে গেলো।

জনি এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় চিৎকার করে উঠলো, মাফিয়া শয়তানটা আবার আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে।

শোয়েব আর রিনিও চমকে উঠে চারপাশে দেখলো। শীলা মনে মনে খুশি হলো উৎপাতটা কেটে পড়েছে দেখে। শোয়েব ব্যস্ত গলায় বললো, আমরা মারাওস্কির ওপর নজর রাখবো। বদমাশ মাফিয়াটা নিশ্চয় আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে লুকিয়ে ফলো করছে মারাওস্কিকে।

ওরা সামনে তাকিয়ে দেখলো এই ফাঁকে, রবার্ট মারাওস্কি অনেকটা পথ এগিয়ে গেছেন। ওরা তাঁকে ধরার জন্য দ্রুত পা চালালো। আকাশে তখন সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে থাকলেও শহরের রাস্তায় অন্ধকার নেমে গেছে। লাইটপোস্টের আলো পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে পুরোনো শহরটাকে আধো

অন্ধকারে রহস্যময় মনে হচ্ছিলো। লোকজন কাজ সেরে ব্যস্ত পায়ে ঘরে ছুটছে শীতের কামড় থেকে বাঁচার জন্য। রিনিদের গায়ে পর্যাপ্ত গরম কাপড় থাকাতে শীতের ভয় ওদের ছিলো না। মাফিয়া নিয়ে শীলার যে ভয় ছিলো সেটাও আর নেই। দূর থেকে ওরা লক্ষ্য করলো মারাওস্কি একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকলেন।

বাড়িটার কাছে এসে ওরা প্রথমে বুঝে উঠতে পারলো না কি করবে। মাফিয়াদের চরটা ধারে কাছে কোথাও নেই। শোয়েব বললো, আমরা কি অপেক্ষা করবো মাফিয়া শয়তানটার জন্য?

পকেট থেকে চুইংগাম বের করে মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে শীলা বললো, ও এখানে আসবে তার কোনো গ্যারান্টি আছে?

না, তা নেই। শোয়েব ইতস্তত করে বললো, তবে মনে হচ্ছে আসতে পারে। এখানে অপেক্ষা করার চেয়ে, রিনি বললো, আমরা বরং মারাওস্কি চাচাকে সাবধান করে দিই।

রিনির প্রস্তাব অন্যদেরও পছন্দ হলো। শীলা মনে মনে রিনিকে ধন্যবাদ জানালো শোয়েবের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ার জন্য।

ক্র্যাকভের পুরোনো শহরের অন্য সব বাড়ির মতো এ বাড়িটার বয়সও পাঁচশ বছরের কম হবে না।একটু গলির ভেতরে বলেই সদর রাস্তার বাড়ির মতো অতটা যত্ন নেয়া হয় না। ওরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেলের সুইচ খুঁজলো। কোথাও কিছু না পেয়ে শোয়েব দরজায় একবার নক করতেই পুরোনো ওক কাঠের পাল্লা দুটো নিঃশব্দে খুলে গেলো, ভেতর থেকে আটকানো ছিলো না বলে। দোতালা বাড়ি। ভেতরে পা রাখতেই জনির গা ছমছম করে উঠলো। হরর মুভিতে যে রকম হন্টেড প্যালেস দেখা যায় ঠিক সেরকম। কোথাও প্রাণের সাড়া নেই। ওরা প্রথম যে ঘরে ঢুকলো সেটা ড্রইং রুম। সোফাগুলো পুরোনো, কার্পেটের রংও জ্বলে গেছে। অবাক হয়ে গেলো ওরা দেয়ালে চোখ পড়াতে। গ্যালারির মতো তিন দিকের দেয়াল পেইন্টিং-এ ঢাকা। আঁকার স্টাইল দেখে রিনির মনে হলো এগুলো অন্তত পক্ষে দুশ বছর আগের আঁকা ছবি। কোনোটা আরো পুরোনো হতে পারে।

জনি চারদিকে দেখে বললো, মারাওস্কি চাচা হঠাৎ কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন?

শোয়েব গলা তুলে ডাকলো–এনি বডি হোম?

কোথাও কারো কোনো সাড়া নেই। এক পা দু পা করে ওরা পাশের ঘরে গেলো। রিনির বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধ্বক করে উঠলো। বুড়ো মারাওস্কির কোনো বিপদ হয় নি তো। কে জানে পুরোনো বাড়িতে চোরাকুঠুরি থাকে। সেরকম কোনো একটায় তাঁকে লুকিয়েও রাখতে পারে।

দুটো ঘর দেখে ওরা তৃতীয় ঘরে পা রেখে চমকে উঠলো। অন্য ঘরগুলোর চেয়ে এ ঘরের আলোটা বেশি উজ্জ্বল। কোনো শিল্পীর ছবি আঁকার স্টুডিও। ইজেলে রাখা মাঝারি আকারের ক্যানভাসে ম্যাডোনার ছবি, আঁকা শেষ পর্যায়ে। কিছুক্ষণ আগেও যে এ ঘরে কেউ ছিলো টের পাওয়া গেলো অ্যাশট্রেতে রাখা সিগারেটের ধোয়া দেখে। সিগারেটের মাথায় বেশ খানিকটা ছাই জমেছে। সেখান থেকে সরু সুতোর মতো নীলচে ধোয়ার রেখা কিছুদূর উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। সারা ঘরে ভ্যাপসা গন্ধ।

রিনি লক্ষ্য করলো ছবিটা খুবই পুরোনো স্টাইলে আঁকা আর বেশ পরিচিতিও মনে হচ্ছে। এ ধরনের ছবি আগেও কোথাও দেখেছে–কোথায় ঠিক মনে করতে পারছে না। শোয়েবকে বললো, মারাওস্কি চাচা যে ছবি আঁকেন বলেছিলেন কথাটা মিথ্যে নয়। তুমি মিছেমিছি ওকে অভিনেতা বানিয়েছে।

রবার্ট মারাওস্কি নামের বিখ্যাত অভিনেতা যে ছবি আঁকতে জানেন না এমন কথা ইনডেক্সে লেখা নেই। শান্ত গলায় শোয়েব বললো, তবে ছবি আঁকিয়ে হিসেবে তাঁর কোনো পরিচিতি নেই। মনে হয় এটা তাঁর সখ, কোনো প্রদর্শনী কখনো করেন নি।

কাছে গিয়ে ইজেলে রাখা ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে রিনি বার বার মনে করার চেষ্টা করছিলো ছবিটা এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেন?

শীলা ছিলো রিনির ঠিক পাশে। জনি আর শোয়েব সামান্য পেছনে। ওদেরও নজর ছিলো ইজেলের সামনে দাঁড়ানো কৌতূহলী রিনির ওপর। ঠিক তখনই পেছন থেকে কারা যেন নিঃশব্দে এসে শোয়েব আর জনির পাঁজরে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে পোলিশ ভাষায় স্বাভাবিক গলায় বললো, কেউ যদি এতটুকু নড়াচড়া করে তাহলে তাকে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হবে। সবাই মাথার ওপর হাত তোলে।

ওরা চারজন মুহূর্তের জন্য পাথরের মূর্তি হয়ে গেলো। শোয়েব আর জনির পাশে দুজন, সামনের দরজায় আরো দুজন ওদের দিকে স্টেনগান উঁচু করে ধরেছে।

মাথার ওপর হাত তুলতে বলা হয়েছে। শোয়েবের পাশের লোকটা কর্কশ গলায় ধমক দিলো।

ওরা দম দেয়া পুতুলের মতো হাত তুললো। হুঁশ ফিরতেই রিনি শোয়েবের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে আবার ধমক খেলো, কেউ এতটুকু নড়াচড়া

লোকটার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরে ঢুকলো দামী স্যুট পরা লম্বা ছিপছিপে শরীরের এক বুড়ো। এক মাথা সাদা চুল আর মুখের ভাজ দেখেই শুধু বুড়ো মনে হয়, দাঁড়ানো আর হাঁটার ভঙ্গীতে মনে হয়

বয়স বুঝি তিরিশের কোঠায়। কর্তৃত্বের গলায় লোকটা শোয়েবকে জিজ্ঞেস করলো, কোন সাহসে আমার বাড়িতে ঢুকেছো?

শোয়েব বললো, আমরা আঙ্কল মারাওস্কিকে অনুসরণ করে এখানে ঢুকেছি। ওঁকে একটা জরুরি কথা বলা দরকার।

কে আঙ্কল মারাওস্কি? জানতে চাইলো সাদা চুল।

তিনি একজন শিল্পী। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে শোয়েব রিনি জনিকে দেখিয়ে বললো, ওয়ারস আসার পথে ওঁর সঙ্গে এদের পরিচয় হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন মাফিয়া লেগেছে তার পিছনে। বিকেলে মাফিয়াদের একজন লোককে যখন দেখলাম তার পিছু নিয়েছে ভাবলাম ওঁকে সাবধান করে দেয়া উচিত।

শোয়েবের পাশের লোকটি জার্মান ভাষায় বললো, হের রেইনহাইম। পাজিগুলো খুব ভালো গল্প ফেঁদেছে। আমি তখন থেকে দেখছি এরা আমাদের ডেরার ওপর নজর রাখছে। নিশ্চয় এরা কিছু জানে। মার দিলেই সব সুড়সুড় করে বলে দেবে। এদের আমার হাতে ছেড়ে দিন।

শোয়েবের ওপর থেকে চোখ না ফিরিয়ে সাদা চুল বললো, এখানে কোনে মারাওস্কি থাকে না। দুঃখিত, তোমাদের গল্পটি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয় নি।

আঙ্কল মারাওস্কি এখানে না থাকলে এসব ছবি কে আকঁলো?

রিনির কথায় সাদা চুল কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে ঠোঁটের কোনে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে তুলে বললো, এগুলো যদি আমি আঁকি তোমাদের কি আপত্তি আছে?

আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি এগুলো আঙ্কল মারাওস্কি এঁকেছেন। ওঁকে আমি ওয়ারসর রয়েল ক্যাসেলে দেখেছি ম্যাডোনার এ ছবিটা কপি করতে।

সাদা চুলের চোখের পাপড়ি সামান্য কাঁপলোতোমরা কি বিশ্বাস করলে আর কি করলে না এ নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। আমার জানা দরকার তোমরা আমাদের কতটুকু জানো। তার ওপর নির্ভর করবে তোমাদের ভবিষ্যৎ। আপাতত তোমাদের আটকে রাখতে হচ্ছে বলে আমি খুব দুঃখিত।

দুঃখিত কথাটা বললো বটে সাদা চুলো, তবে ওর চেহারায় দুঃখের লেশমাত্র ছিলোনা।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোক ঘরে ঢুকলো দড়ি হাতে। অত্যন্ত দক্ষ হাতে ওদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। রাগে শীলার গা রি রি করে কাঁপছিলো। ওকে বাঁধার সময় চিৎকার

করে বললো, আমাদের এভাবে আটকে রেখে ভেবো না পার পেয়ে যাবে। তোমাদের প্রত্যেককে এর ফল ভোগ করতে হবে।

ওরা কেউ শীলার কথার উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না।

৭-৮. পেজেক আর ত্রয়কার অভিযান

০৭. পেজেক আর ত্রয়কার অভিযান

অরবিস-এর অফিসে গাড়ি জমা দিয়ে নিজের পাওনা বুঝে নিয়ে পালকের মতো হালকা মনে ভাসতে ভাসতে বাড়ি এসে দরজায় কড়া নাড়লো পেজেক। পুরোনো আর নতুন শহরের সীমানায় পুরোনো ধরনের এক বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ির চারতলার এক অ্যাপার্টমেন্টে বাবা মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে থাকে পেজেক। বাবা ছিলেন লবন খনির শ্রমিক, বছর তিনেক আগে কোমরে পাথর চাপা পড়ে পঙ্গু হয়ে হুইল চেয়ারের আশ্রয় নিয়েছেন। মা পৌরসভার অফিসে সামান্য বেতনের কেরানী। বছর দুয়েক ধরে জিনিসপত্রের দাম এত বেড়েছে যে বাবার পেনশন, মায়ের বেতন এক করলেও সংসারের খরচ কুলোয় না। তাই বাধ্য হয়ে পেজেক রাতের স্কুলে ভর্তি হয়ে দিনে গাড়ি চালানোর কাজ নিয়েছে।

কড়া নাড়ার ধরন দেখেই মা বুঝলেন পেজেক এসেছে। অফিস থেকে ফিরে মাত্র রান্না চড়িয়েছিলেন তিনি। অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে এসে দরজা খুললেন।

কাগজের প্যাকেট থেকে রিনির দেয়া স্কার্ফটা মায়ের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললে, তোমার পছন্দ হয়েছে মা?

কদিন আগে পেজেক ওঁকে ছেঁড়া শাল রিপু করতে দেখেছে। নতুন স্কার্ফ দেখে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মৃদু হেসে বললেন, দারুণ সুন্দর দেখতে। নিশ্চয় অনেক দাম নিয়েছে?

দাম কম নয়। ভেতরে নিজের কামরায় যেতে যেতে পেজেক বললো, তবে জিনিসটা আমি কিনি নি। বাংলাদেশের এক ট্যুরিস্ট উপহার দিয়েছে।

অবাক করলি বাছা। পেজেকের মা সত্যি সত্যি অবাক হলেন–টুরিস্ট তোকে এত দামী স্কার্ফ উপহার দিলো কেন?

জানি না কেন দিয়েছে। বোধ হয় আমাকে ভালে লেগেছে। বলতে গিয়ে লজ্জায় লাল হলো পেজেক।

তোর বাপের বয়সী কোনো ট্যুরিস্ট বুঝি। বাড়িতে তোর মতো ছেলে আর বউ ফেলে এসেছে?

না মা, বয়স্ক কোনো লোক নয়। আমার কাছাকাছি বয়সের একটা মেয়ে। পরির মতো সুন্দর দেখতে।

বলিস কিরে। এতটুকু মেয়ে বাংলাদেশ থেকে আমাদের ক্র্যাকভ এসেছে বেড়াতে?

একা নয় মা, ওরা চার ভাই বোন মনে হলো। দুজন ওয়ারস থাকে, আর দুজন লন্ডন থেকে বেড়াতে এসেছে। বেশ বড়লোকের ছেলেমেয়ে মা। আমার ভাড়া হয়েছিলো এক লাখ পঁচাত্তর হাজার, অথচ দিয়েছে পুরো দুলাখ যুলটি। দুপুরে দামী রেস্তোরাঁয় খাইয়েছে। দারুণ ভালো ওরা।

কাল বিকেলে ওদের কফি খাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন কর না? আমি তাহলে সজির পিঠা বানাই

সত্যি বলছো মা। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি ওদের বলতে। আজ রাতেও ওরা আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে।

তোর বাবার মোটা মাফলারটা নিয়ে যা। রাতে বাইরে ঘুরিস না।

ঠিক আছে মা। বলে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে পেজেক দ্রুত পা চালালো-রিনিরা যেখানে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। যেতে যেতে ঠিক করলো রিনিকে বলবে ওকে চিঠি লেখার জন্য ওর অনেক দিনের সখ ইউরোপটা ঘুরে দেখবে। লন্ডনে একটা বন্ধু থাকলে দারুণ হবে।

জায়গা মতো এসে রিনিদের দেখতে না পেয়ে খুবই অবাক হলো পেজেক। আশে পাশে ঘুরে দেখলো কোথাও ওদের কারো কোনো চিহ্ন নেই। একেবারে কোনো চিহ্ন নেই বললে ভুল হবে। শীলার চুইংগামের রঙিন কাগজের টুকরো দেখলো, ওরা যেখানে বসেছিলো সেই টেবিলের তলায়। সকাল থেকে পেজেক লক্ষ্য করেছে শীলা চুইংগাম খেতে খুবই পছন্দ করে। ওকেও কয়েকবার দিয়েছে যদিও ও ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলো। কি মনে করে ও চুইংগামের মোচড়ানো মোড়কটা তুলে নিয়ে খুলে দেখলো ওর জন্য কোনো কিছু ওতে লেখা আছে কি না।

পেজেক রীতিমতো হতাশ হলো। মনে হলো বেশি ঠাণ্ডা পড়ায় ওরা বোধহয় হোটেলে ফিরে গেছে। সকালে হোটেলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় রিনি ওদের হোটেলটা ওকে দেখিয়েছে। কথাটা মনে হতেই আর দেরি করলো না পেজেক। একরকম ছুটে গেলো হোটেলে।

অরবিস হোটেলের ম্যানেজার পেজেককে খুব ভালো করেই চেনে। বললো, ওরা যে সেই সকালে বেরিয়েছে এখনো ফেরে নি। কেন, তোমার ভাড়া মিটিয়ে দেয় নি?

ভাড়া মিটিয়েছে। ওরা আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে।

তুমি ভাগ্যবান। লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে পারো। নিশ্চয়ই আসবে। আমি লক্ষ্য করেছি ভারতীয়রা দেরি করে ডিনার খায়।

ম্যানেজারের কথা মতো পেজেক লাউঞ্জে গিয়ে বসলো। টেলিভিশনে তখন দুর্ধর্ষ এক মারপিটের ছবি দেখাচ্ছে। অন্য সময় হলে পেজেক সব কিছু ভুলে ছবি দেখতে কিন্তু ওর মন খুব বিক্ষিপ্ত ছিলো। সারা দিনে ওদের যতটুকু জেনেছে, ডিনারের নেমন্তন্ন করে ভুলে যাবে, এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে রিনি কক্ষনো ভুলতে পারে । তবে কি ওরা ছবি চোরের কোনো সন্ধান পেয়েছে? ওরা তো দুর্গের কাছেই বসেছিলো? হতে পারে ছবি চোরকে দেখে ওরা ওকে অনুসরণ করে কোথাও গেছে। কিংবা পুলিস স্টেশনেও যেতে পারে চোরের খবর দেয়ার জন্য।

একের পর এক নানা ধরনের চিন্তা পেজেকের মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। শেষে মনে হলো যেখানেই ওরা যাক, ওকে যখন আসতে বলেছে নিশ্চয় ওখানে আবার ফিরে আসবে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেজেক উঠে দাঁড়ালো। রিসিপশনে গিয়ে ম্যানেজারকে বললো, আমি ঘুরে আসছি। ওরা এলে বলবেন, আমি আবার আসবো।

রাত তখন প্রায় আটটা। পুরোনো শহরের পথঘাট একরকম ফাঁকা হয়ে গেছে। দুদিন আগে পেজেক টেলিভিশনে দেখেছে ওয়ারস আর গোনস্কে বরফ পড়েছে। ক্র্যাকভে বরফ না পড়লেও হিমেল বাতাসে বরফের কামড় ঠিকই টের পাচ্ছিলো। শীতের আঁচড় থেকে বাঁচার জন্য, সেই সঙ্গে রিনিদের জন্য উৎকণ্ঠার কারণে পেজেক এক দৌড়ে এসে পৌঁছলো আগের সেই জায়গায়।

চত্বরে একটা লোকও নেই। অল্প দূরের কফি শপে কয়েকজন বুড়ো খদ্দের বসে আছে। পাশের বার–এ হৈ হল্লা হচ্ছে। এ ছাড়া আর কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। দূরে দুর্গটা জোছনাভেজা আকাশের গায়ে রাজ্যের রহস্য গায়ে মেখে শুয়ে আছে। পাঁচটার পর দুর্গের প্রধান ফটক বন্ধ হয়ে যায়। রাতে কেয়ারটেকারও দুর্গের ভেতরে থাকে না।

ক্র্যাকভের বাসিন্দারা জানে এ দুর্গকে ঘিরে অনেক কাহিনী আছে। জিপসিদের গানের কথায় সেকালের রাজাদের অনেক অত্যাচারের বিবরণ থাকে। একবার রাজার সঙ্গে নদীর ওপারের গ্রামের এক ছেলের কি এক গন্ডগোল হয়েছিলো। রাতের অন্ধকারে রাজার লোকজন গোটা গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। তাদের আত্মারা নাকি এখনো দুর্গের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। পূর্ণিমার মেলায় জিপসিরা সেই সব আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করে, ধবধবে সাদা ছাগল বলি দেয়।

চত্বরে দাঁড়িয়ে জিপসিদের মেলার কথা ভাবতে গিয়ে পেজেকের মনে হলো রিনিরা জিপসিদের আস্তানার দিকে যায় নি তো। বিশেষ করে রিনি তো যা কিছু অদ্ভুত জিনিস দেখে সবই কিনে ফেলতে

চায়। হতে পারে কিছু কেনার জন্য ওরা ওখানে গেছে। মেলা শুরু হওয়া পর্যন্ত ওরা যে ক্র্যাকভ থাকছে না, এ কথা ওদের কাছ থেকে সকালেই জেনেছে পেজেক।

প্রতি বছর ক্র্যাকভে এসে এক মাসেরও বেশি থাকে জিপসিরা। ওদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় আছে পেজেকের। আস্তানায় গিয়ে ত্রয়কার খোঁজ করলো সে। ওরই বয়সী, জিপসি সর্দারের ছেলে। দারুণ বুদ্ধিমান, দুবছর আগে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। স্থানীয় লোকজন জিপসিদের খুব অপছন্দ করে জায়গা নোংরা করে বলে । জিপসিরাও তাদের দেখতে পারে না। তবে বন্ধুর জন্য ওরা জান দিতে পারে। ত্রয়কা সব সময় বলে, বিপদে সত্যিকারের বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়। কখনো যদি কোনে বিপদে পড়িস, আমাকে খবর দিবি। দেখিস তোর জন্য কি করি।

ত্রয়কাকে ওদের তাঁবুতেই পাওয়া গেলো। পেজেককে দেখে ও হৈচৈ করে উঠলো–আজ বিকেলে এসেই তোর খোঁজ করেছিলাম। বললো, তুই নাকি কোন ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্ট নিয়ে বেরিয়েছিস সারা দিনের জন্য। কেমন আছিস বল ।

ত্রয়কার গলা শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ওর মা। পেজেকের থুতনি নেড়ে আদর করে ওর কপালে চুমু খেয়ে বললেন, এক বছরে অনেক লম্বা হয়েছে। রাতে না খেয়ে যেও না।

পেজেককে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাবু থেকে বেরিয়ে গেলেন ত্রয়কার মা। ত্রয়কা বললো, তোর চেহারাটা এত শুকনো লাগছে কেন রে পেজেক। খিদে পেয়েছে?

না ত্রয়কা। মাথা নাড়লো পেজেক । তুই যে ট্যুরিস্টদের কথা বললি ওরা ইন্ডিয়ার বাংলাদেশের।

একই কথা। তোর মন খারাপ কেন সে কথা বল।

ত্রয়কা, আমার মনে হচ্ছে ওরা কোনো বিপদে পড়েছে। এই বলে পেজেক সারা দিনের ঘটনা খুলে বললো ত্রয়কাকে।

সব শুনে ত্রয়কা বললো, তোর তাহলে মনে হচ্ছে ছবি চোরটাকে ধরতে গিয়ে ওরা কোনো বিপদে পড়েছে?

আমার তাই ধারণা।

ওরা চারজন। আর ছবি চোর একা।

চোরটার পেছনে আরও কেউ থাকতে পারে। ওরা বার বার বলছিলো মাফিয়া বলছিলো।

মাফিয়ার কথা বলেছে?

তাই তো বললো। তুই চিনিস নাকি মাফিয়াকে?

ওরে বোকা ছেলে, মাফিয়ার নাম শুনিস নি? এমন ভাবে বলছিস, যেন মাফিয়া কোনো ছিঁচকে চোরের নাম।

মাফিয়া তাহলে কে?

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গুন্ডাদের দল। ওরা ইচ্ছে করলে আমাদের ওয়ালেসাকেও সাত দিনের ভেতর গদি থেকে হটিয়ে দিতে পারে।

ওরা থাকে কোথায়?

আসল ঘাঁটি ইটালীতে। তবে ইউরোপ আমেরিকায় এমন কোনো বড় শহর নেই যেখানে ওদের লোক পাওয়া যাবে না।

তাহলে তো রিনিদের ভয়ানক বিপদ হতে পারে?

যার পেছনে ওরা লেগেছে সে যদি সত্যি সত্যি মাফিয়াদের লোক হয় তাহলে খুবই ভয়ের কথা।

ত্রয়কার কথা শুনে পেযেকের বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেলো। ভাঙা গলায় বললো, ত্রয়কা, ওরা খুব ভালো। আমাদের দেশের জিনিস কে নাকে চুরি করছে, এ নিয়ে ওদের চেয়ে বেশি মাথাব্যাথা হওয়ার কথা আমাদের। আমাদের জিনিস রক্ষা করতে গিয়ে ওরা বিপদে পড়েছে, আমি ভাবতেই পারি না।

তুই বলতে চাইছিস আমাদের কিছু করা উচিৎ?

নিশ্চয় ত্রয়কা। ওদের জন্য নয়, আমাদের লজ্জা থেকে বাঁচার জন্যই ওদের খুঁজে বের করতে হবে। দেখতে হবে ওদের যেন কোনো বিপদ না হয়।

তাহলে চল, আগে হান্না দিদিমার কাছে যাই।

হান্না দিদিমা কে?

ভবিষ্যৎ বলতে পারে। ক্রিস্টাল বল দেখে বলতে পারবে ওরা কোথায় আছে।

এক্ষুণি চল।

ত্রয়কাদের তাঁবু থেকে অল্প দূরেই হান্নাবুড়ির তাঁবু। ওরা যখন ওর তাঁবুতে ঢুকলো তখন বুড়ি শোয়ার আয়োজন করছিলো। ত্রয়কাকে দেখেই বললো, খুদে সর্দারকে খুব পেরেশান মনে হচ্ছে? সঙ্গে এটি কে, বন্ধু নাকি।

জানো যখন সব, জিজ্ঞেস করো কেন?

খিক খিক করে হেসে হান্না বুড়ি বললো, জিজ্ঞেস না করলে যে বোবা হয়ে থাকতে হয়। আর জানতে না চাইলে জানা যায় না–এ কথাটা জেনে রাখিস রে ভালো করে।

শোনো দিদিমা। আমার বন্ধু পেজেকের ভারি বিপদ। ওর বিপদ মানে আমাদেরও বিপদ। এই বলে ত্রয়কা রিনিদের নিখোঁজ হওয়ার কথা সব বললো। মাফিয়ার প্রসঙ্গও বাদ দিলো না।

ত্রয়কার কথা শুনে–হুম, বলে হান্নাবুড়ি কতক্ষণ চোখ বুজে চুপচাপ বসে রইলো। তারপর এক কোণে রাখা মস্ত বড় তোরঙ্গ থেকে কালো মখমলের পেটমোটা থলে বের করলো। তাঁবুর মাঝখানে রাখা ছিলো ছোট্ট উঁচু টেবিল। মখমলের থলে থেকে তার স্ফটিক গোলকটি বের করে টেবিলে রাখলো। টেবিলের তলায় মাটির পাত্রে কয়লার আগুন ছিলো তাঁবুর ভেতরটা গরম রাখার জন্য। লালচে গনগনে কয়লার ওপর ধুপের গুড়োর মতো কি যেন ছিটিয়ে দিলো। সুগন্ধী ধোঁয়ায় তাঁবুর ভেতরটা সাদা হয়ে গেলো। হান্না বুড়ি স্ফটিক গোলক সামনে রেখে কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলো । তারপর হাত দুটো স্ফটিক গোলকের ওপর দিয়ে বুলানোর ভঙ্গি করলো।

ক্রয়কার কাছে এ দৃশ্য নতুন নয়। কিন্তু পেজেক আগে কখনো এসব দেখে নি। বুড়ির কান্ড কারখানা দেখে ওর চোখ দুটো আলু হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ চোখ বুজে বিড় বিড় করে অদ্ভুত এক ভাষায় মন্ত্র পড়লো হান্নাবুড়ি। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো স্ফটিক গোলকের দিকে। মাথাটা সামান্য দোলালো ওপরে নিচে। নিচু গলায় বললো, তোমাদের অনুমান মিথ্যে নয়। ওদের মাথার ওপর বিপদের তলোয়ার ঝুলছে।

ওটাকে আগে সরাও দিদিমা। তারপর বলল ওরা এখন আছে কোথায়?

এই শহরে আছে। তবে বেশিক্ষণ নেই।

কোথায় আছে বলতে পারবে?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে হান্নাবুড়ি বললো, ওরা গেছে উত্তরে। উত্তর থেকে পুবে। আবার উত্তরে। এর বেশি জানি না।

ঘর থেকে ততক্ষণে ধোয়ার সাদা মেঘ সরে গেছে। স্ফটিক গোলকটা হান্নাবুড়ি আবার মখমলের থলেতে ঢুকিয়ে তোরঙ্গে তুলে রাখলো।

পেজেক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখছিলো হান্নাবুড়িকে। যা বলেছে তা কি সত্যি? ত্রয়কা ওর হাত ধরে টানলো–চল বেরিয়ে পড়ি। দিদিমা এখন আর এর চেয়ে বেশি বলবে না।

হান্নাবুড়ির তাঁবু থেকে বেরোতেই ত্রয়কার বয়সী একটা ফাজিল টাইপের মেয়ে, কোথায় যেন যাচ্ছিলো, পেকেককে দেখে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো–একে আবার কোত্থেকে জোটালি ত্রয়কা?

আমার বন্ধু পেজেক। ওর চারজন বাঙালী বন্ধু হারিয়ে গেছে। তাই হান্না দিদিমার কাছে এসেছিলাম।

ত্রয়কার কথা শুনে থমকে দাঁড়ালো মেয়েটা–এক মিনিট দাঁড়া। চারজনের ভেতর দুটো ছেলে দুটো মেয়ে? একটা ছেলে দারুন হ্যান্ডসাম দেখতে?

মাথা নেড়ে সায় জানালো মেয়েটা। সন্ধ্যেবেলা দেখেছি। বুরঝিনিস্কি বুড়োর কফি শপের কাছে। হন্তদন্ত হয়ে জাদুঘরের দিকে যাচ্ছিলো।

সঙ্গে আর কেউ ছিলো?

না তো। হারিয়ে গেলে পুলিশে খবর দিচ্ছিস না কেন?

তোকে অনেক ধন্যবাদ এলিজা। এই বলে ত্রয়কা পেজেকের হাত ধরে ছুটলো জাদুঘরের দিকে।

ছুটতে ছুটতে পেজেক বললো, হান্না দিদিমা যে বললেন, ওরা উত্তরে গেছে।

আমরা তো যাচ্ছি দক্ষিণে।

এলিজা নিজের চোখে যখন দেখেছে, তখন ওটা আগে যাচাই করে দেখি।

বুরঝিনিস্কির দোকানে আসতে ওদের দশ মিনিট লাগলো। বুড়ো দোকানে শুধু কফি বেচে না, ফুলও বেচে। আশেপাশে যেসব দোকানপাট ছিলো সব বন্ধ। শুধুমাত্র বার আর কফিশপগুলো খোলা। বুরঝিনিস্কির দোকানের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বুড়োর তিনকুলে কেউ নেই, দোকানের ভেতরই থাকে। রাতে কারো ফুলের দরকার হলে দরজায় ধাক্কা দেয়। ওর দোকানে চব্বিশ ঘন্টা ফুল পাওয়া যায়।

পেজেক বললো, বুড়োকে জিজ্ঞেস করে দেখবো ওদের দেখেছে কি না।

দেখতে পারিস। সন্ধ্যের পর থেকে বুড়ো যেভাবে ভদকা টানে মনে তো হয় না কিছু বলতে পারবে।

পেজেক কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিলো শেষের বার বেশ জোরে। ভেতর থেকে কফ জড়ানা ঘড়ঘড়ে গলা শোনা গেলো–আস্তে বাপু আস্তে! এত তাড়া কিসের! বুরঝিনিস্কির ফুল পেলে কি মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠবে, নাকি রাজকন্যা মিলবে। কথা বলতে বলতে এসে দরজা খুলে খদ্দের না দেখে হতাশ হলো বুড়ো—কেন ইয়ার্কি মারছিস বাছা! নেশাটা মাত্র জমে এসেছিলো, তুই খেলনাগাড়ির পেজেক না?

হ্যাঁ খুড়ো! আমার ভারি বিপদ। তুমি কি আজ সন্ধ্যায় চারজন বিদেশী ছেলেমেয়েকে এ পথ দিয়ে যেতে দেখেছো?

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবলো বুড়ো বুরঝিনিস্কি। তারপর মাথা নেড়ে বললো, সন্ধ্যের কথা বলছিস? হা সন্ধ্যেই হবে। রাত হলে তো ঠাহর পেতাম না। দুটো ছেলে আর দুটো মেয়েকে দেখেছিলাম ওপাশের গলিতে ঢুকতে। বিপদ কেন রে পেজেক? তোর ভাড়া মেরে দিয়েছে, না অচল নোট দিয়েছে?

ওসব কিছু না খুড়ো, ওরা খুব ভালো। তুমি শুতে যাও। এই বলে বুরঝিনিস্কির সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে এলো পেজেক আর ত্রয়কা। সবাই জানে বুড়ো যাকে একবার সামনে পাবে কম করে হলেও একটি ঘন্টা বকবক করবে।

সরে আসতে আসতে ওরা শুনলে বুড়ো বলছে–আজকাল কে ভালো আর কে মন্দ স্বয়ং ঈশ্বরও বলতে পারবেন না। আর তুই হলি সেদিনের পুঁচকে ছোঁড়া। বললেই হলো–

পেজেক আর ত্রয়কা ততক্ষণে উল পটেঝনা রাস্তার শেষ গলির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে ওরা হতাশ হলো। গলিটা ছোট, একমাথা বন্ধ, তবু দুপাশে কম করে হলেও ষোল সতেরোটা বাড়ি। রিনিরা কোন বাড়িতে ঢুকেছে কে জানে। বুড়োর কথা শুনে মনে হচ্ছে ওরা নিজের ইচ্ছায় এসেছে। কেউ কি ওদের কোনো কিছুর লোভ দেখিয়ে এনেছে? নাকি সেই চোরটা এ সব বাড়ির কোনোটাতে থাকে? পাকা গোয়েন্দার মতো ভাবনাগুলো মাথার ভেতর সাজাতে লাগলো পেজেক। টেলিভিশনে গোয়েন্দা ছবি আর গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ে পেজেক এই বয়সেই ঝানু হয়ে গেছে।

এক পা দুপা করে হাঁটতে হাঁটতে দুটো বাড়ি পেরিয়ে এলো। তৃতীয় বাড়ির সামনের রাস্তায় চোখ পড়তেই চমকে উঠলো পেজেক। চাঁদের আলোয় রূপোলি রাংতা চিকচিক করছে। কাছে গিয়ে তুলে দেখলো, ঠিক যা ভেবেছিলো তাই। শীলার চুইংগামের মোড়ক। তার মানে ওর একটা অনুমান সঠিক হলো–ওরা এখানে নিজের ইচ্ছায় এসেছে।

কথাটা ত্রয়কাকে বলতে সেও সায় জানালো। প্রশ্ন করলো, এখন কি করবি? ভেতরে যাবি?

না। আমি দুটো দিক ভাবছি। যদি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসে থাকে তাহলে কাজ সেরে ওরা হোটেলে ফিরে যাবে। রাত এখন মাত্র সাড়ে নটা কাল সকালে খবর নেবো ওরা হোটেলে ফিরেছে কিনা। না ফিরলে পুলিস নিয়ে আসবো। এর যে কোনো একটা বাড়িতে ওদের পাওয়া যাবে।

পুলিসের কাছে এখন যেতে অসুবিধে কোথায়?

ওরা যদি বেড়াতে আসে এখানে? কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হবে না? উল্টো পুলিসকে মিথ্যে খবর দেয়ার জন্য আমাদের কয়েদ করবে।

আপাতত তাহলে কিছু করার নেই? জানতে চাইলো ত্রয়কা।

একটা খোঁজ তো পেলাম। আপাতত এতেই চলবে। বাকিটা কাল সকালে। তুই আটটার মধ্যে চলে আসবি আমার বাসায়। জানিস তো মা তোকে কত পছন্দ করেন।

আমার চেয়ে বেশি করে নিককে। ওটাকেও আনবো।

ত্রয়কার পোষা বাঁদরের নাম নিক। শুধু পেজেকের মা কেন, ওদের বাড়ির সবাই পছন্দ করে ওটাকে। ভাবসাব দেখে মনে হয় অতিশয় বুদ্ধিমান এক বুড়ো মানুষ।

শেষ পর্যন্ত ওদের একটা হদিস পাওয়া গেলো। এতক্ষণে মুখে হাসি ফুটলো পেজেকের। ভারি দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো আমার।

ত্রয়কা মুখ টিপে হেসে বললো, এই দুশ্চিন্তার কথাটা তোর সেই পরির মতো মেয়েটাকে বলিস।

পেজেক লাজুক হাসলো। পরির মতো মেয়েটা তখন যে কি এক ভয়ঙ্কর অবস্থায় আছে ওর কল্পনাতেও এলো না।

.

০৮. গন্তব্য–লেকার্তের রাজপ্রাসাদ

মাটির নিচের একটা ঘরে হাত পা বেঁধে রেখে দেয়ার পর রিনিদের হুশ ফিরে এলো যখন শীলা তীক্ষ্ণ গলায় বললো, আমি তোমাদের বার বার বলেছিলাম এসব বদমাশদের পেছনে লাগতে যেও না। এখন বোঝা অ্যাডভেঞ্চার করার মজা।

সবাই চুপচাপ শীলার কথা শুনলো। একটু পরে শীলা আবার বললো, বড়দের বাদ দিয়ে নিজেরা একা একা ঘুরে বেড়ানোর এমন একটা সুযোগ পেলাম, সব মাটি হয়ে গেলো। শোয়েব ভাইকে না আনলেই ভালো হতো।

রিনি আস্তে আস্তে বললো, শোয়েবকে কেন দোষ দিচ্ছো শীলা? ও না এলে। আমাদের এখানে বেড়াতে আসাই হতো না।

এখন ভালো করে বেড়াও। শোনোনি কি বললো ওরা? লেকার্ত না ফেকার্ত কোথায় নিয়ে যাবে। তারপর দেখো ঠিক ঠিক হাত পা নুলো করে জিব কেটে যোবা বানিয়ে রাস্তায় বসিয়ে দেবে ভিক্ষে করার জন্য।

ডিকেন্সের উপন্যাস পড়ে তোমার এরকম ধারণা হয়েছে। শান্ত গলায় বললো রিনি। এসব একশ বছর আগে হতো, এখন হয় না।

জনি অসহিষ্ণু গলায় বললো, তুই কিরে আপু! আমরা কি এখন ডিকেন্সের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করবো, না এখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজবো!

বিপদে পড়লে রিনি সব সময় চেষ্টা করে মাথা ঠান্ডা রাখতে। গত বছর একদিন স্কুলের একটা ফাংশনের জন্য ফিরতে রাত হয়েছিলো। উডগ্রীন স্টেশনে ও ছাড়া আর কেউ নামে নি। প্ল্যাটফর্মে

দাঁড়িয়েছিলো বিচিত্র চেহারার এক পাঙ্ক। লম্বায় সাত ফুটের কাছে, দৈত্যের মতো শরীর। রিনিকে একা দেখে হাই হানি, বলে এগিয়ে এলো। পাঙ্কটা দু পা এগোতেই রিনি ছুটে গিয়ে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটার ফিতে শক্ত করে ধরে ওর মুখে আঘাত করলো। ঘটনাটা ঘটতে তিন সেকেন্ড ও লাগে নি। রিনির জিনসের ব্যাগে ছিলো হার্ড মেটালের টিফিন বক্স, শক্ত রেক্সিন আর চামড়ায় বাঁধানো লাইব্রেরি থেকে আনা গোটা চারেক বই, জ্যামিতি বাক্স–এই সব। এমনিতেই সের তিনেকের মতো ওজন আর ছুটে গিয়ে জোরে মারাতে পাঙ্কটার মনে হলো মুখের ওপর বুঝি পাঁচশ পাউন্ডের বোমা ফেটেছে। গড! বলে চিৎকার করে দুহাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়লো। জ্ঞান হারাবার আগে শুনলো, পুঁচকে মেয়েটা ওকে শান্ত গলায় বলছে, আশা করি এর পর থেকে একা কোনো মেয়ে দেখলে দ্র ব্যবহার করবে।

বিপদের সময় রিনিকে শান্ত থাকতে দেখে শোয়েবের খুব ভালো লাগলো। তারপরও ওর মনে হলো, বেড়াতে এসে এ ধরনের ঝামেলায় নাক না গলালেই ভালো ছিলো। রিনির উৎসাহ দেখে ও সবাইকে নিয়ে মাফিয়াটার পেছনে লাগতে গিয়েছিলো। ও অবাক হচ্ছিলো এত তাড়াতাড়ি শয়তানগুলো মারাওস্কিকে কোথায় গুম করে ফেললো! ওদের চারজনকে বেঁধে ফেলার পর সাদাচুলো ওর সঙ্গীকে বলেছিলো, আপাতত সেলার–এ নিয়ে ফেলে রাখো। আমাদের মাল যখন লেকার্ত যাবে তখন একটা ভ্যানে তুলে দিও। ওখানে গিয়ে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবো।

সাদাচুলো কথা বলছিলো জার্মান ভাষায়। কথা বলার ভঙ্গী দেখেই বোঝা যায় ও খাঁটি জার্মান। পোলদের জার্মান উচ্চারণ শুনলে আলাদা ভাবে চেনা যায়।

লেকার্ত জায়গাটা শোয়েবের অচেনা নয়। যেশভ–এ ওর এক বন্ধু থাকে। এক সামারে ওর কাছে বেড়াতে গিয়ে লেকার্ত–এর রাজপ্রাসাদ আর জাদুঘর দেখতে গিয়েছিলো। যেশভ থেকে মাত্র বাইশ কিলোমিটার দুরে রাশিয়ার সীমান্তের কাছে। ওদের লেকার্তে নিয়ে কি করা হবে এ নিয়ে ভাবছিলো শোয়েব। সেই সঙ্গে ভাবছিলো পালাতে হলে এখান থেকেই সুবিধে বেশি। একঘন্টা শোয়েব ভাবছিলো একটা কিছু করতে হবে। শীলার অভিযোগ শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা মিথ্যে নয়। শোয়েবের ভালো লাগলো রিনিকে ওর পক্ষ নিয়ে বলতে দেখে।

যে জায়গায় ওদের রাখা হয়েছে সেটা এক সময় ভাড়ার ঘর ছিলো। ছাদের সঙ্গে লাগানো ছোট স্কাইলাইটের জানালা ছাড়া একটা মাত্র দরজা সিঁড়ির মাথায়। ঘরটা মাটির বেশ নিচে। ঘরের দেয়ালের তাকে মদের বোতল সাজানো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক অদরকারি জিনিস। পেপারওয়েট, টেনিস র‍্যাকেট, মলাট ছেঁড়া কতগুলো বই, ভাঙা টেবিল ল্যাম্প কিছুই বাদ নেই।

শোয়েবকে চুপচাপ দেখে জনি আবার ঝাঝালো গলায় বললো, তুমি মুখে তালা দিয়ে বসে আছো কেন শোয়েব ভাই? কিছু বলছে না যে?

কি বলবো? কাষ্ঠ হেসে শোয়েব বললো, শীলা সত্যি কথাই বলেছে। আমারই জন্য তোমাদের এত ঝামেলা।

ঝামেলা নয় শোয়েব ভাই। বিপদ বলল। উই আর ইন গ্রেট ডেঞ্জার। রহস্য কাহিনী পড়ে আর থ্রিলার ছবি দেখে সামান্য বিপদকেও অনেক বাড়িয়ে দেখে জনি। যদিও ওদের বিপদ সামান্য ছিলো না।

ঠিক বলেছো জনি ভাইয়া। শীলা ওকে সমর্থন করে বললো, আমার মনে হয় ওদের কথা মতো আমরা যদি নুলো ফকির হতে রাজী না হই, তাহলে আজ রাতটাই হবে আমাদের শেষ রাত।

রিনি শান্ত গলায় বললো, ওরা এখনও আমাদের নুলো ফকির বানাবার কোনো প্রস্তাব দেয় নি। তুমি একটু বেশী কল্পনা প্রবণ শীলা।

দেয় নি ঠিকই, তার মানে এই না যে কখনও দেবে না। তোমার কি ধারণা লেকার্ত নিয়ে গিয়ে আমাদের অনারে ওরা পার্টি থ্রো করবে?

না, তাও করবে না। রিনি আগের মতো শান্ত গলায় বললো, ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করছে না। ভাবছে ওদের কোনো গোপন খবর আমরা জেনে ফেলেছি। যে জন্যে আমার মনে হয় ওদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দূরে কোথাও নিয়ে আমাদের আটকে রাখবে, তারপর কাজ হয়ে গেলে ছেড়ে দেবে।

কি করে তোমার ধারণা হলো ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে? বাঁকা গলায় প্রশ্ন করলো শীলা।

কারণ মাফিয়ারা অকারণে কাউকে খুন করে না। ওরা এমন সব খুন করে যার কথা ওরা স্বীকার করে। আমাদের খুন করে সে দায় ওরা নিতে পারবে না।

শোয়েব বললো, তোমার কথায় যুক্তি আছে রিনি। কিন্তু লেকার্ত জায়গাটা সুবিধের নয়। ওখান থেকে শুরু হয়েছে দুর্গম কার্পেথিয়ান রেঞ্জ। তিন দেশের সীমান্তের কাছে ওখানকার গভীর বন হচ্ছে ক্রিমিনালদের স্বর্গ। আমাদের মেরে ফেললে কেউ টেরও পাবে না।

আমরা কি মেরে না ফেলা পর্যন্ত এভাবে গল্পগুজব করে কাটাবো? জানতে চাইলো জনি।

আমরা পালাবো এখান থেকে। কোর্টে রায় দেয়ার মতো ঘোষণা করলো শোয়েব।

কিভাবে? শোয়েবের কথায় সবাই উত্তেজিত হলো। কারণ ওদের দুহাত পিছমোড়া করে বাঁধা। পা দুটো একসঙ্গে বাঁধা। এ বাঁধন ছিঁড়ে বেরোনো কল্পনার বাইরে। সিঁড়ির দরজাও বাইরে থেকে তালা দেয়া।

আমি কয়েকটা পথ ভেবে রেখেছি। একটা না হলে আরেকটা চেষ্টা করবো। প্রথমে আমাদের বাঁধনগুলো খুলতে হবে। তারপর তোমরা তিনজন যেভাবে বসে আছো সেভাবেই থাকবে। আমি সিলিংএর ওপরে উঠে যাবো। বোধহয় লক্ষ্য করো নি, যে দরজা দিয়ে আমাদের ঢোকানো হয়েছে তার ঠিক ওপরে সিলিং শেষ হয়েছে। সিলিং এর ওপর কাঠের যে পিপেগুলো রয়েছে আমার ধারণা ওর একটাও খালি নয়। দরজা দিয়ে যে ঢুকবে একটা করে ভারি পিপে ওর মাথায় পড়বে। যেই ঢুকুক তার সঙ্গে নিশ্চয় পিস্তল থাকবে। আমাদের কাজ হবে পিস্তলটা নিয়েই স্কাই লাইটের জানালায় গুলি করা। তাতে জানালার কাঁচও ভাঙবে, গুলির শব্দে বাইরে লোকজনের সঙ্গে পুলিসও এসে হাজির হবে। ক্র্যাকভ হচ্ছে মিউজিয়াম সিটি। এখানে গুলি দূরে থাক সামান্য পটকার আওয়াজও কেউ করতে পারে না। পিস্তল না পাওয়া গেলে জানালার কাঁচ ভাঙার অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। আমার প্ল্যানের একটাই খারাপ দিক হচ্ছে গুলির শব্দে ক্রিমিনালরাও অ্যালার্ট হয়ে যাবে। পুলিস আসার আগেই ওরা পালাবে। ওদের আর ধরতে পারবো না।

শোয়েবের কথা শুনে সবাই চমৎকৃত হলো। যে শীলা এতক্ষণ ওর ওপর চোটপাট করছিলো মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো শোয়েবের বুদ্ধির কাছে ওরা কেউ কিছু নয়। বললো, ক্রিমিনালদের ধরতে না পারার দুঃখ নিয়ে সারা জীবন ভাববো। এখন হাত পাগুলো খুলবো কি করে তাই বলো।

নিজেরটা নিজে খুলতে না পারলেও অন্যেরটা তো পারবো। কেউ প্রথমে গড়িয়ে গড়িয়ে আমার হাতের কাছে এসো। নিজেদের পা আর হাতের গিটগুলো হাতে ধরিয়ে দাও। একটু সময় লাগলেও মনে হচ্ছে খুলতে পারবো। তাড়াহুড়ো করে বাঁধতে গিয়ে ওরা আমার হাত বেঁধেছে দুই তালুর সঙ্গে লাগিয়ে।

রিনি ছিলো শোয়েবের কাছে। সবচেয়ে দূরে ছিলো জনি। ও বললো, আপু, তুই আগে যা। আমার মনে হচ্ছে এখান থেকে গড়াতে গেলে হাতের গোড়া আলগা হয়ে যাবে।

রিনি পিছমোড়া করে বাঁধা হাতে মাটিতে ভর দিয়ে নিজেকে অতি কষ্টে শোয়েবের কাছে আনলো। দুজন দুদিকে মুখ করে বসে, কেউ কারো হাত দেখতে পাচ্ছিলো না। শোয়েবকে দুবার বলতে হলো, আরো কাছে এসো রিনি, নাগাল পাচ্ছি না।

শেষবার হাতে ভর দিয়ে কাছে আসতে গিয়ে রিনি ধাক্কা খেলো শোয়েবের পিঠের সঙ্গে। প্রথমে ওর কড়ে আঙ্গুলের সঙ্গে শোয়েবের হাতের ছোঁয়া লাগলো। কব্জির বাঁধন শোয়েবের আঙ্গুলের কাছে নিতে গিয়ে হাতের গোড়ায় প্রচণ্ড ব্যথা পেলো। রিনির চোখে কান্না এসে গেলো। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করে চুপ করে রইলো সে।

শোয়েব রিনির বাঁধনের গিটটা ভালোভাবে অনুভব করলো। তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত মনোযোগ নিজের আঙুলের ডগায় এনে দশ মিনিটের কঠিন পরিশ্রমের পর গিটটা খুললো।

গিট খোলার সঙ্গে সঙ্গে রিনি খুশির চোটে আরেকটু হলেই শোয়েবকে জড়িয়ে ধরতো। দেরি না করে ও আগে ঘুরে বসে শোয়েবের বাঁধন খুললো তারপর ওরা দুজন নিজেদের পায়ের বাঁধন খুলে শীলা আর জনির বাঁধন খুলে দিলো। শীলা আনন্দে উত্তেজিত হয়ে জনির দু গালে চুমু খেলো। জনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, এসব পরে হলেও চলবে। ওরা যে কোনো সময়ে চলে আসতে পারে।

আসতে পারে নয়, এসে গেছে।

ঘরের ভেতর যেন হাজার পাউন্ডের বোমা ফাটলো। খসখসে গলাটা ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো দৈত্যের মতো দুটো নোক ওদের দিকে পিস্তল উচিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। খসখসে গলা আবার বললো, আরেকটু আগেই আসতে পারতাম। একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিলো, তাই দেরি হলো। বাছারা বোধহয় জানেন না এ বাড়ির সবগুলো ঘরে ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা বসানো আছে। ফন্দি ফিকির কিছু গোপন করার উপায় নেই।

ওদের পেছনে যে আরেকটা ঘর ছিলো আর সেখান থেকে যে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে, ওরা বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারে নি। চট করে শোয়েবের কথা মনে হলো জনির। ও ছিলো রিনির আড়ালে। চোখের পলকে ও বাঁ পাশে ঝুঁকে একটা ভাঙা পেপার ওয়েট তুলে প্রচন্ড জোরে ছুঁড়ে মারলো স্কাইলাইটের জানালায়। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হতেই জনি চিৎকার করে বাংলায় বললো, সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালাও। এই বলে নিজে ছুটে গেলো সিঁড়ির দিকে। তখনই গুলির শব্দ হলো।

গুলির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ গলা চিৎকার করে বললো, খবরদার কেউ গুলি ছুড়বে না। ক্ষুদে শয়তানগুলোকে জ্যান্ত ধরতে হবে।

রিনি চিৎকার করে বললো, বাঁচাও, কে কোথায় আছো।

সঙ্গে সঙ্গে শোয়েব, শীলা আর জনিও চিৎকার করে উঠলো–বাঁচাও বলে। শোয়েব আর শীলা চিৎকার করছিলো পোলিশ ভাষায়, রিনি জনি ইংরেজিতে। চিৎকার আর গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরও চারজন বিশাল দেহী দৈত্য ঘরে ঢুকলো। এরপর রিনিদের ধরতে ওদের বেশি বেগ পেতে হলো না। ধরার সঙ্গে সঙ্গে মুখ চেপে কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো। হাতগুলো বাঁধলো আগের চেয়ে শক্ত

করে। পা বাঁধলো না। খসখসে গলা বললো, লেকার্তো নিয়ে কুচি কুচি করে কেটে নেকড়েদের খাওয়াবো। দেখবো তখন কে বাঁচাতে আসে।

ওদের মুখ আর হাত এত শক্ত করে বাঁধা হয়েছিলো যে ব্যথায় কান্না এসে গেলো। কিছু বলার উপায় নেই। করারও জো নেই, ওদের গলায় ধাক্কা দিয়ে সেলার থেকে বের করে নিয়ে গেলো দৈত্যের মতো লোকগুলো। বাইরের দরজার সঙ্গে লাগানো ছিলো বড় ভ্যানের দরজা। ধাক্কা মেরে ওদের ছুঁড়ে দিলো ভেতরে নিরেট অন্ধকারে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো বাইশ টনী বিশাল ভ্যানের ইঞ্জিন।

পরদিন সকালে বাদর কাঁধে ত্রয়কাকে নিয়ে পেজেক যখন অরবিস হোটেলে রিনিদের পেলো না, তখন রীতিমতো ঘাবড়ে গেলো। ম্যানেজার বললো, আমি পুলিশে খবর দিয়েছি। ওয়ারসতে ওদের ঠিকানায় খবর পাঠানো হয়েছে। বুঝতে পারছি না, কোথায় উধাও হয়ে গেরো জলজ্যান্ত চারটা হাসিখুশি ছেলে মেয়ে!

আমার ধারণা ওদের কেউ কিডন্যাপ করেছে। চিন্তিত গলায় বললো পেজেক। আমাদের ক্র্যাকভে এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটে নি।

ত্রয়কাকে নিয়ে পেজেক প্রথমে এলো পুলিস স্টেশনে। তদন্তকারী অফিসারকে বললো শেষবার রিনিদের কোথায় দেখা গেছে। সেই সঙ্গে ছবি চুরির ব্যাপারে ওদের সন্দেহের কথাও বললো। অফিসার সব কথা শুনে হেসে ফেললো ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক সব হলিউডি ছবি দেখে বিদেশী ছেলেমেয়েগুলো একেবারে বখে গেছে। সব কিছুতে রহস্য আর রোমাঞ্চ খুঁজতে চায়। মাফিয়াদের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই আমাদের ওয়াভেল দুর্গে আসবে ছবি চুরি করতে। আমাকে যা বলেছিস, বাইরে আর এসব আজগুবি গপ্পো কাউকে বলতে যাস নি ছোঁড়া!

ওদের শেষবার যে বাড়িতে দেখা গেছে সেখানে একবার যেতে কি আপনাদের অসুবিধে আছে?

পেজেকের শান্ত অথচ শক্ত কথায় অফিসার একটু অস্বস্তি বোধ করলো। ধমকের সুরে বললে, ঠিক আছে যাচ্ছি। না পেলে পুলিসকে হয়রানি করার মজা টের পাওয়াবো।

সঙ্গে গোটা চারেক কনস্টবল আর পেজেকদের নিয়ে অফিসার এলো উল পটেঝনার শেষ গলিতে। যে বাড়ির সামনে পেজেক শীলার চুইংগামের মোড়ক পড়ে থাকতে দেখেছিলো সে বাড়ির দরজায় মস্ত এক তালা ঝোলানো। আশে পাশের বাড়িতে জিজ্ঞেস করা হলো কাল সন্ধ্যায় কেউ চারটা বিদেশী ছেলেমেয়েকে এ পাড়ায় কিংবা এ বাড়িতে দেখেছে কিনা। কেউ কোনো হদিস দিতে পারলো না।

পাশের বাড়ির এক চিমসে বুড়ো বললো, গত ছমাস ধরে এ বাড়িতে তালা ঝুলতে দেখছি। বিদেশী ছেলেমেয়ে কোত্থেকে আসবে!

পেজেককে কড়া ধমক লাগিয়ে অফিসার তার দলবল নিয়ে চলে গেলো। বন্ধুর বিমর্ষ চেহারা দেখে ত্রয়কা সহানুভূতির গলায় বললো, এখন কি করবি পেজেক?

আমার খুব খারাপ লাগছে ত্রয়কা। পেজেক বিষণ্ন গলায় বললো, মনে হচ্ছে ওরা কঠিন কোনো বিপদে পড়েছে। আমার উচিৎ ওদের সাহায্য করা, অথচ কি যে করবো ভেবে পাচ্ছি না!

পুলিস তো ওদের ঠিকানায় খবর পাঠিয়েছে। কেউ মুক্তিপণের জন্যেও ওদের আকটাতে পারে। আমার মনে হয় শত্রুপক্ষের কাছ থেকে চিঠি আসা পর্যন্ত আমাদের চুপচাপ থাকা উচিৎ।

হাঁটতে হাঁটতে বুরঝিনিস্কির কফি শপের সামনে আসতেই ওরা বুড়োর নজরে পড়ে গেলো। পেজেকের চেহারা দেখে বুড়ো জিজ্ঞেস করলো, মড়ার মতো মুখ বানিয়ে। ঘুরছিস কেন রে ছোঁড়া? বাড়িতে কিছু হয়েছে?

পেজেক ম্লান মুখে বললো, কাল রাতে তোমাকে বলেছিলাম না–চারজন বিদেশী ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, বলেছিলি বটে। ওরা কি তোর বন্ধু ছিলো?

খুব ভালো বন্ধু ছিল।

আহা রে! বলে বুরঝিনিস্কি কি যেন ভাবলো। তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়লো ওর। উত্তেজিত গলায় বললো, কাল রাতে গলির ভেতর কিছু ঘটেছে মনে হয়।

কি ঘটেছে? চমকে উঠে জানতে চাইলো পেজেক।

মাঝ রাতে আমাকে প্রকৃতি ডেকেছিলো। উঠে চোখে মুখে একটু পানি ছিটিয়ে প্রকৃতির কাজ শেষ করে আবার শুতে যাবো, এমন সময় কে যেন দরজা ধাক্কালো। গিয়ে দরজা খুলোম। দেখি ট্রাক ড্রাইভার টাডেউজ আর যাচেক। বললে, খুড়ো, শীতে হাড় মাস সব জমে বরফ হয়ে গেলো। একটু কফি যদি বানাতে পারো ডবল দাম দেবো। আমি ওদের ভেতরে এনে বসালাম। কফির সঙ্গে দুটো বিস্কুটও দিলাম। বললাম, এই শীতের ভেতর মাঝরাতে কোথায় যাচ্ছো? ওরা বললো লেকার্তের প্রাসাদে নাকি কি জরুরী সাপ্লাই যাবে। ওরা কফি খাওয়া শেষ করে নি–হঠাৎ শুনি জানালার কাঁচ ভাঙার শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলির শব্দ। কারা যেন অনেক দূর থেকে বলছে বাঁচাও। তক্ষুণি একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে যাচেকদের নিয়ে গেলো। গোলমালের ভেতর হারামজাদা দুটো

আমার কফির দাম না দিয়েই লরি নিয়ে ভেগে গেছে। এই বলে বুড়ো একটু থেমে পেজেককে বললো, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে। হয়তো তোর বন্ধুরাই কোনো বিপদে পড়েছে। গলির ভেতরের বাড়িগুলো ভালো করে খুঁজে দ্যাখ।

পেজেক বললো, এখানে কেউ নেই। তুমি কি ঠিক শুনেছো যাচেকরা তোমাকে লেকার্তের রাজপ্রাসাদের কথা বলেছে?

ঠিক কেন শুনবো না? ঝাঁঝালো গলায় বুরঝিনিস্কি বুড়ো বললো, কানে তো এখনও পচন ধরে নি। আর মাঝরাতে নেশার ঘোরও থাকে না। আমার যা শোনার পষ্টই শুনেছি। তোর বিশ্বাস হলো না তো বয়েই গেলো। ভোর না হতেই জ্বালাতে এসেছে। ভালোয় ভালোয় এখনই কেটে পড়। সকালে আমার অনেক কাজ থাকে।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বুরঝিনিস্কি খুড়ো। এই বলে ত্রয়কাকে নিয়ে পেজেক ছুটলো অরবিস হোটেলে। যেতে যেতে হয়কাকে ও বললো, পুলিস ওদের খোঁজার ব্যাপারে কোনোই সাহায্য করবে না। মনে হচ্ছে এখানকার পুলিস অফিসারও শয়তানদের পক্ষের লোক।

হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারের কাছ থেকে নম্বর নিয়ে ওয়ারসতে বাংলাদেশ দূতাবাসে ফোন করলো পেজেক। রাষ্ট্রদূতকে অফিসেই পাওয়া গেলো। পেজেক সংক্ষেপে ওর পরিচয় দিয়ে গত কালকের ঘটনা আর বুরঝিনিস্কির সর্বশেষ ভাষ্য জানালো ওঁকে। রাষ্ট্রদূত উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, ক্র্যাকভের পুলিস কমিশনার আমাকে শুধু বলেছে শীলাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এক্ষুণি ক্র্যাকভ রওনা হচ্ছিলাম। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের লেকার্তে যাওয়াই উচিৎ হবে।

পেজেক বললো, ক্র্যাকভের পুলিসের কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। আপনি লেকার্ত আসুন। আমি আর আমার এক বন্ধু এখনই লেকার্তের পথে রওনা হচ্ছি। রাজপ্রাসাদের ওপর নজর রাখা দরকার।

টেলিফোনে কথা না বাড়িয়ে ত্রয়কাকে নিয়ে পেজেক ছুটলো রেল স্টেশনের দিকে। দশটার ট্রেন ধরতে পারলে তাড়াতাড়ি যেশভ পৌঁছতে পারবে। নইলে যেতে হবে বাসে। দেড়ঘন্টা বেশি সময় লাগবে ওতে । স্টেশনের পথে ছুটতে ছুটতে ওর মনে হচ্ছিলো প্রতিটি মুহূর্ত এখন সোনার চেয়ে দামী ।

.

০৯. রাজপ্রাসাদে আরেক ষড়যন্ত্র

রিনিদের যখন লেকার্তের রাজপ্রাসাদে এনে লরি থেকে নামানো হলো তখন ওদের দেখাচ্ছিলো ঝড়ো কাকের মতো। সবার চুল উসকো খুসকো, চোখের নিচে কালি পড়েছে যেন অনেক রাত ঘুমোয় নি । শোয়েবের কপাল কেটে গিয়েছিলো লরিতে ছুঁড়ে ফেলার সময়, সেখানে রক্ত জমে কালচে হয়ে আছে। শীলার ঠোঁট কেটেছে, জনির মাথার পেছনে সুপুরি আর রিনির কনুই ছিলে গেছে।

লরির দরজা খুলে খসখসে গলার দৈত্যটা বললো, এক রাতেই কাবু হয়ে গেলে যে বীরযোদ্ধারা। এখনও অনেক কিছু বাকি আছে। নেমে এসো সবাই। লেকার্তের রাজপ্রাসাদে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এই বলে খ্যাস খ্যাস করে হায়নার মতো হাসলো সে।

হাত বাঁধা, মুখ বাঁধা অবস্থায় নামতে গিয়ে ওদের মাথা ঘুরছিলো, পা টলছিলো, তবু কেউ কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করলো না। অতিকষ্টে লাফিয়ে নামলো।

খসখসে গলা এগিয়ে এসে মুখের বাঁধন খুলে দিলো। বললো, গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচালেও আধ মাইলের ভেতর কেউ তোমাদের গলা শুনবে না। অনুগ্রহ করে আমাকে অনুসরণ করো। তোমাদের জন্য রাজকীয় প্রাতরাশ অপেক্ষা করছে।

লরি থামানো হয়েছিলো রাজপ্রাসাদের সামনে নয়, পেছন দিকে। ওয়ারসর রাজপ্রাসাদের চেয়ে লেকার্তের রাজপ্রাসাদ অনেক বড় মনে হলো। চারদিকে ওক, এম, বার্চ আর লাইম গাছের সাজানো বন। মাঝে মাঝে ফাঁকা ঘাস জমিতে পাথরের বাগান, মর্মর মূর্তি, ফোয়ারা আর পানির নহর। শ্বেত পাথরে বাঁধানো বারান্দার ওপর দিয়ে হেঁটে ওরা প্রাসাদের একটা কামরায় ঢুকলো। বড় দরজার কাছে দুজন বন্ধুকধারী প্রহরী। খসখসে গলার সঙ্গে ওর সঙ্গীও রিনিদের পেছন পেছন কামরায় ঢুকলো। কামরার মাঝখানে লম্বা পাথরের টেবিলের চারপাশে গোটা দশেক রাজকীয় চেয়ার। টেবিলে খাবার সাজানো। রুটি, মাখন, ডিম আর অরেঞ্জ জুস।

খসখসে গলা আপ্যায়নের ভঙ্গীতে বললো, দেরি না করে বসে পড়লেই হয়। আমাদের আরো গেস্ট আছে।

ওরা কেউ বুঝতে পারলো না হঠাৎ এই আপ্যায়নের ঘটা কেন। খিদের কথা কারো মনে ছিলো না। খাবার দেখে মনে হলো বহুদিন ধরে বুঝি ওরা উপোষ রয়েছে। তবু শীলা শক্ত গলায় বললো, হাত বাঁধা অবস্থায় কিভাবে খাবো আমরা?

শোয়েব বললো, মুখ হাত না ধুয়ে কিছু খেতে পারবো না।

ভুল হয়ে গেছে। বলে আবার খ্যাস খ্যাস করে হাসলো দৈত্যটা। ওদের হাতের বাঁধন খুলে দিতে দিতে বললো, পাশে বাথরুম আছে। একজন একজন করে যাও। আমি খুব দুঃখিত, এই বেলা তোমাদের গরম পানি দিতে পারছি না। দুপুরে তাও পাবে।

পানি ঠাণ্ডা হলেও বাথরুমে তোয়ালে, সাবান, টুথপেস্ট সবই ছিলো। এক এক করে ওরা চারজন বাথরুম থেকে যথাসম্ভব পরিপাটি হয়ে বেরোলো। চেয়ারে যেই বসতে যাবে সামনে দরজায় চোখ পড়তে রিনি চমকে উঠলো। মাফিয়াদের সেই শুটকো চরটা এসে একটা চেয়ার টেনে বসলো। লোকটা চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে শীলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ধারালো গলায় বললো, এই নোংরা মাফিয়াটার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

শীলার কথা শুনে শুকোর চোখ দুটো আলুর মতো গোল হয়ে গেলো পাশে দাঁড়ানো খস খসে গলা খ্যাস খ্যাস করে হেসে উঠলো। ঠিক তখনই ঘরে ঢুকলো রবার্ট মারাওস্কি। বললো, ও কেন মাফিয়ার এজেন্ট হতে যাবে? মাফিয়ারা ওকে বাড়ির চাকরও রাখবে না।

বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত বাকহারা হয়ে গেলো ওরা চারজন। রিনি তীক্ষ্ম গলায় বললো, আপনি এখানে, এদের সঙ্গে?

অমায়িক হেসে বুড়ো মারাওস্কি বললো, এরা সব আমারই লোক।

কে আপনি? কেন মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলেন আমাদের। এই লোকটাই বা কে? রাগে রি রি করে কাঁপছিলো রিনি ।

অতো উত্তেজিত হওয়ার কি আছে। ঠাণ্ডা মাথায় বসে নাশতা খাও। সব বলবো। এই বলে মারাওস্কি খসখসে গলার দিকে তাকালো–এদের খাওয়াদাওয়ার যেন কোনো অসুবিধা না হয়। আমি কনফারেন্স রুমে আছি।

মারাওস্কি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর রিনি শোয়েবকে বাংলায় বললো, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

শোয়েব বললো, আগে নাশতা খাই, তারপর আলোচনা করা যাবে।

রিনি লক্ষ্য করলো, মারাওস্কির কথায় যাকে মাফিয়ার এজেন্ট বলে এ কদিন জেনে এসেছিলো সে মাথা নিচু করে চুপচাপ রুটিতে মাখন লাগাচ্ছে। রিনি ওকে ইংরেজিতে বললো, আমি দুঃখিত। না জেনে আপনাকে মাফিয়ার এজেন্ট বলেছি।

আপনার পরিচয় কি জানতে পারি?

শুকনো হেসে শুটকো লোকটা বললো, আমি এজেন্ট বটে, তবে মাফিয়ার নই, ইন্টারপোলের।

ইন্টারপোল মানে আন্তর্জাতিক পুলিস বিভাগ, অপরাধী ধরার জন্য যারা পৃথিবীর যে কোনো দেশে যেতে পারে?

ঠিক ধরেছো। রুটিতে কামড় দিয়ে ইন্টারপোলের এজেন্ট বললো, আমার নাম জঁ শিরাক। প্যারিস থেকে ফলো করছি বদমাশটাকে। ক্র্যাকভে এসে ধরা পড়ে গেলাম।

মারাওস্কি আসলে কে?

ও একজন ধুরন্ধর চোর, দুর্লভ পেইন্টিং চুরি করার একজন বিশেষজ্ঞ। আদি বাড়ি জার্মানীতে। নাম ভাঁড়িয়ে পোল্যান্ডে আস্তানা গেড়েছে। বছর পাঁচেক আগে ও আমাস্টার্ডাম থেকে ভ্যানগগের একটা ছবি চুরি করেছে। পোল্যান্ড থেকে রাফায়েল আর দ্য ভিঞ্চির ছবি চুরির মতলব করেছে ও।

রিনি খেতে খেতে বললো, ক্র্যাকভে ওর আখড়ায় গিয়েই সেটা আমি বুঝেছিলাম । তার আগে আমরা আপনাকেই চোর ভেবে বসেছিলাম। ওয়াভেল দুর্গে কাল সকালে আপনি কি করছিলেন?

দেখছিলাম, ওখান থেকে ও অলরেডি একটা ছবি সরিয়েছে। নিখুঁত কপি করতে পারে ও। নতুন ছবি পুরোনো করার টেকনিকও জানে। যে জন্যে ছবি কখন খোয়া যায় কিছু টের পাওয়া যায় না জাদুঘর আর প্রাসাদের পাহারাদারদের ঘুষ দিয়ে সে বশ করে। ওদের সাহায্যে আসল ছবি সরিয়ে নকল ছবি ঝুলিয়ে দেয় দেয়ালে।

শোয়েব বললো, আমিও ঠিক তাই অনুমান করেছিলাম।

ওরা কথা বলছিলো ইংরেজিতে। খসখসে গলা কিংবা ওর সঙ্গী কেউ ইংরেজি বোঝে না। রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করছিলো ওরা। পুঁচকেগুলোকে ধমক দেয়ার জন্য ওর গলাটা নিশপিশ করলেও মারাওস্কির নির্দেশের কারণে কিছু বলতে পারছিলো না। সুযোগটা ওরা ভালোভাবেই নিলো। বললো, মারাওস্কির ক্র্যাকভের ডেরাতে সাদাচুলের এক জার্মানকে দেখেছিলাম। মনে হলো এদের নেতা সে। আপনি ওর কথা কিছু জানেন?

ঠিক ধরেছো তোমরা। শিরাক বললো, ও হচ্ছে কার্ল রেইনহাইম। নিও নাজী আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা। পোল্যান্ডের দায়িত্বে আছে ও।

নিও নাজী মানে? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো জনি।

তোমরা নিশ্চয় জানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীতে হিটলারের পার্টিকে বলা হতো নাজী পার্টি। তার বাহিনী ছিলো নাজী বাহিনী, যারা লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের পর্যন্ত গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মেরেছে। বাচ্চার মায়েদের মেরেছে। ফ্রান্সের লিয়তে নাজী বাহিনী আমার বাবা আর বড় ভাইকে হত্যা করেছে। তোমরা এসব কল্পনাও করতে পারবে না। কথা বলতে গিয়ে ভারি হয়ে এলো শিরাকের গলা।

রিনি সমবেদনার গলায় বললো, আপনি বোধহয় জানেন না একাত্তরে বাংলাদেশে আমরা যখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিলাম, পাকিস্তানী সৈন্যরা নাজী বাহিনীর মতোই আমাদের দেশে গণহত্যা করেছে। ওরা আমাদের তিরিশ লক্ষ নিবীহ মানুষকে হত্যা করেছে।

আমি জানি। স্বাভাবিক গলায় শিরাক বললো, হিটলারের নাজী পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইদানিং জার্মানীতে আর ইউরোপের কয়েকটি দেশে বর্ণবিদ্বেষী কিছু লোক নব্য নাজী পার্টি গঠন করছে। পোল্যাণ্ডেও এদের তৎপরতা শুরু হয়েছে। ওরা মনে করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ঠিক কাজ করেছিলো।

রিনি বললো, আমাদের দেশে একাত্তরের ঘাতকদের একটা দল আছে। ওটার নাম জামাতে ইসলামী। ওরাও বলে একাত্তরে তারা লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাঙালীকে হত্যা করে ভুল করে নি। আমাদর দেশটাকে ওরা আবার পাকিস্তান বানাতে চায়।

রিনির কথা শুনে শোয়েব রীতিমতো অবাক হলো। শীলার মতো হালকা স্বভাবের মেয়েও নয়, তাই বলে এতটা সচেতন এটা শোয়েব ভাবতেও পারে নি।

শীলা বললো, এসব রাজনীতির বিষয় নিয়ে পরেও আমরা আলোচনা করতে পারবো। মিস্টার শিরাক কি দয়া করে বলবেন এরা আমাদের কেন এভাবে আটকে রেখেছে? কি চায় আমাদের কাছে? কবে আমরা মুক্তি পাবো?

শুকনো হেসে শিরাক বললো, আমার ব্যাপারে ওদের সিদ্ধান্ত জানি। ওরা আমাকে হত্যা করবে। কারণ আমি ইহুদি, তার ওপর ইন্টারপোলের এজেন্ট, মারাওস্কির শয়তানী জেনে গেছি। তোমাদের ব্যাপারে শুনেছি সরকারের সঙ্গে দর কষাকষি করবে । ওদের দুজন দুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে ওয়ালেসার সরকার মাস তিনেক আগে বন্দী করেছে। নাজী পার্টি এখানেও নিষিদ্ধ। নাজীরা এখানেও লক্ষ লক্ষ পোলদের হত্যা করেছিলো।

রিনি বললো, এখান থেকে পালাবার কি কোনো পথ নেই?

গত এক বছর ধরে সংস্কারের কাজ চলছে বলে রাজপ্রসাদ দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কার্ল রেইনহাইম প্রাসাদের পুরোনো গার্ডদের টাকা দিয়ে বশ করেছে। দুজন ওর কথা শোনে নি বলে ওদের খুন করেছে। এখন এই প্রাসাদের পুরোটাই ওদের দখলে। মাটির তলা দিয়ে টানেল চলে গেছে কার্পেথিয়ানের গভীর বনে। খুবই সুরক্ষিত জায়গা এটা। দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টার পাহারা বসানো আছে। পালাবার কোনোপথ নেই।

শীলা বললো, আপনি কি জানেন মিস্টার শিরাক, বাবাকে ওরা কখন খবর পাঠাবে?

ওই নোংরা ইহুদিটা কি করে জানবে? হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো মারাওস্কি। একটা চেয়ার টেনে বসে বললো, দুচার দিন যাক, তোমাদের জন্য যথেষ্ট উতলা হওয়ার পর্যাপ্ত সময় দিতে চাই তোমার বাবাকে। যাতে আমাদের শর্ত মানার জন্য তিনি এবং তাঁর সম্প্রদায় চাপ দিতে পারে সরকারের ওপর।

মিস্টার শিরাককে কেন আটকে রাখা হয়েছে জানতে পারি?

রিনির প্রশ্ন শুনে খিক খিক করে হাসলো মারাওস্কি–কার্ল রেইনহাইমের ইচ্ছে ইহুদি ইঁদুরটাকে খাঁচায় পুরে প্রাসাদের হ্রদে ডুবিয়ে মারি । আমার ইচ্ছে ওকে বাঁচিয়ে রাখা। ভবিষ্যতে আমি যদি কোনো বিপদে পড়ি সেক্ষেত্রে ইহুদিটা ভালো জামানত হতে পারে। জানোই তো কত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় আমাকে। পার্টির জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

তুমি কি বলবে লণ্ডন থেকে কেন আমাদের পিছু নিয়েছো? আমরা তো তোমার কোনো ক্ষতি করি নি।

ক্ষতি কোথায়, তোমরা তো আমার উপকারই করলে। তোমরা ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমার হয়ে পাঁচ কেজি হেরোইন বয়ে আনলে ওয়ারস। ইউরোপের বাজারে যার দাম আট লাখ পাউন্ড। তোমাদের এ উপকার আমি ভুলবো না।

ইয়ার্কি মেরো না জনি শক্ত গলায় বললো, এত উপকার করার ফল বুঝি এভাবে আমাদের আটকে রাখা? তোমার লোকজন আমাদের ওপর যে অত্যাচার করেছে কিছুই আমরা ভুলি নি।

ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। দুঃখের লেশমাত্র ছিলো না মারাওস্কির গলায়-তবে কথা হলো কি, তোমরা যদি আমাদের ঘাঁটিতে না ঢুকতে, তাহলে তোমাদের এ হাল হতো না।

তুমি অতি বড় অকৃতজ্ঞ, শয়তান। ধারালো গলায় রিনি বললো, ওটা তোমার ঘটি না কি কিছুই জানি না আমরা। শিরাক তোমাকে ফলো করছে দেখে ভাবলাম তুমি বিপদে পড়তে যাচ্ছে। তাই তোমাকে সাবধান করার জন্য তোমার পিছু পিছু আমরা ও বাড়িতে ঢুকেছিলাম।

আমি জানি কার্ল তোমাদের কথা বিশ্বাস করে নি বলে সামান্য কষ্ট দিয়েছে। আমি তখন ওখানে ছিলাম না। পরে এসে যখন শুনলাম তখন কার্লকে বকে দিয়েছি। ভবিষ্যতে এরকম হবে না। তোমরা এখানে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াও। লুকোচুরি খেলো, হ্রদে গিয়ে সাঁতার কাটো–যা খুশি করো, শুধু বাইরে যাওয়ার কথা ভেবো না। কে জানে কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে। এই বলে মারাওস্কি খসখসে গলার দৈত্যটাকে নির্দেশ দিলো–ইহুদিটাকে ওর কামরায় নিয়ে আটকে রাখো। আর এই ছেলেমেয়েরা ভালো হয়ে থাকবে।

মারাওস্কি বেরিয়ে যাওয়ার পর শিরাক নিচু গলায় বললো, দুদিন সময় আছে। ভেবে চিন্তে পালাবার একটা প্ল্যান করবো। তোমরা ভয় পেও না। আমি–

খসখসে গলা এগিয়ে এসে শিরাকের কনুই ধরলো–কোনো কথা নয়।

নিজের ঘরে চলো। এই বলে ওকে ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেলো।

পেজেক আর ত্রয়কা যখন লেকার্ত এসে পৌঁছালো, সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। ত্রয়কার পরনে জিপসিদের পোশাক কাঁধে পোষা বাদর, পেজেক রাস্তা থেকে একটা খড়ের টুপি কিনে চাষীদের বখা ছেলের মতো হাঁটছিলো রাস্তা দিয়ে। দুজনকেই মনে হচ্ছিলো গ্রামের ছেলে। লেকার্ত খুবই ছোট জনপদ। রাজপ্রাসাদ দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকলে অনেকে আসে বাইরে থেকে। তবে গত এক বছর ধরে এই এলাকায় প্রাণের কোনো স্পন্দন আছে বলে মনে হয় না। রাতে রাজপ্রাসাদে নাকি অতৃপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। সেই ভয়ে লোকজন প্রাসাদের ধারে কাছে আসে না । রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের কাছে সাইনবোর্ড লেখা সংস্কারের কাজ চলছে। দর্শনার্থী বা বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ। ওটা না দেখার ভান করে গ্রাম্য ছেলের কৌতূহল নিয়ে গেজেক আর ত্রয়কা ফটকের দিকে এগোতেই যেন মাটি খুঁড়ে দু জন সশস্ত্র প্রহরী সামনে এসে দাঁড়ালো। একজন কর্কশ গলায় বললো, নোটিস চোখে পড়ে নি? ভাগগা এখান থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় পাওয়ার ভান করে দুপা পিছিয়ে এলো পেজেক আর ত্রয়কা। পেজেক ভয়ে ভয়ে বললো, আমরা প্রাসাদে ঢুকবো না। গাছের কিছু মরা ডাল কুড়িয়ে নেবো, যেগুলো মাটিতে পড়ে আছে।

না, হবে না। কঠোর গলায় বললো প্রহরী, এক্ষুণি পালাও, নইলে গুলি করবো।

পেজেক আর ত্রয়কা পা চালিয়ে পালিয়ে এলো। রাজপ্রাসাদের চারপাশ দিয়ে গভীর খালের মতো কাটা রয়েছে। এক সময় পানির স্রোত বইতো সেখানে, এখন শুকনো ঘাসের জঙ্গল আর আগাছায় বোঝাই

হয়ে আছে। কিছুদূর গিয়ে পেজেক আর ক্রয়কা সেই খালের ভেতরে নেমে গেলো। পুরো খালটা পা চালিয়ে ঘুরে আসতে একঘন্টার বেশি সময় লাগলো । রাজপ্রাসাদের পশ্চিম দিক থেকে একটা সুড়ঙ্গের মতো এসে খালে মিশেছে, সম্ভবত পানি সরার জন্য। পেজেক বললো, মনে হয় এখান দিয়ে ঢোকা যাবে।

ত্রয়কা বললো, এখনই ঢোকা ঠিক হবে না। একটু অন্ধকার নামুক।

পেজেক বললো, এখন তাহলে আমরা সদর রাস্তায় গিয়ে শীলার বাবার জন্য অপেক্ষা করতে পারি। নইলে তিনি সরাসরি প্রাসাদে এসে বিপদে পড়বেন।

পেজেক হিসেব করে দেখেছিলো গাড়ি নিয়ে সকাল দশটায় যদি শীলার বাবা ওয়ারস থেকে রওনা হন, লেকার্ত পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। সন্ধ্যার আগেই ওরা শহরে ঢোকার বড় রাস্তার মাথায় গিয়ে দাঁড়ালো।

বেশিক্ষণ ওদের অপেক্ষা করতে হলো না। মিনিট কুড়ি পরেই দেখলো রাষ্ট্রদূতের কালো মার্সেডিজ আসছে দ্রুত গতিতে। ওপরে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে পতপত করে। পেছনে একটা পুলিশের গাড়ি, আরেকটা মিলিশিয়ার ভ্যান।

হাত তুলে পেজেক পতাকাওয়ালা গাড়ি থামালো। কাছে গিয়ে বললো, স্যার আমার নাম পেজেক। মনে হচ্ছে শীলারা প্যালেসের ভেতরে আছে। চারপাশে কড় পাহাড়া দিচ্ছে। দিনের আলোয় যাওয়া ঠিক হবে না।

রাষ্ট্রদূতের পাশে ছিলেন পুলিশের চীফ কমিশনার বিগনিউ জাকোবস্কি আর মিলিশিয়ার একজন সিনিয়র অফিসার। গাড়ির সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বিশালদেহী আঁদ্রে আর শীলাদের গ্রে হাউন্ড স্পটি। পেযেকের কথা শুনে পুলিসের চী বললেন, পেজেক ঠিকই বলেছে এক্সেলেন্সি। আমরা সন্ধ্যার পর প্যালেস ঘেরাও করে ওদের আত্মসমর্পণ করতে বলবো। আপনি দয়া করে মিউজিয়ামের গেস্ট হাউসে বিশ্রা নিন।

আমি এখানেই ভালো থাকবো। শান্ত গায় রাষ্ট্রদূত বললেন, ওরা যদি আত্মসমর্পণ না করে আমার ছেলে মেয়েদের সামনে রেখে গুলি চালায় তখন কি হবে?

পেজেক বললো, পুলিশের ঘেরাও করার আগে আমি আর ত্রয়কা সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রাসাদে ঢুকবো। শীলারা যাতে নিরাপদ থাকে সে দায়িত্ব আমার।

পেজেকের বুদ্ধি আর সাহস দেখে মুগ্ধ হলেন রাষ্ট্রদূত। বললেন, সেক্ষেত্রে তোমর আমার কুকুরের সাহায্য নিতে পারে। শীলারা কোথায় আছে ও সঙ্গে থাকলে বেশি খুঁজতে হবে না।

স্পটিকে দেখার পর থেকে ক্রয়কার পোষা বাঁদর নিক ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। স্পা একবার ওই অদ্ভুদ প্রাণীটার দিকে তাকিয়েছিলো তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে। তারপর পেজে আর ত্রয়কাকে শুঁকে দেখে ভাব জমালো।

অল্প কিছুক্ষণ পরই সন্ধ্যার কুয়াশায় ভর করে অন্ধকার নামলো লেকার্তের ছোয় জনপদে। চারপাশের গাছপালার ভেতর জমে থাকা অন্ধকার কালো আলকাতরার মতে গড়িয়ে পড়লো সবখানে। আকাশে চাঁদ ছিলো। অন্ধকার তাই বেশি জমাট বাঁধতে পারলো না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী পেজেক আর ত্রয়কা রাজপ্রাসাদের পশ্চিমের সুড়ঙ্গ দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। সদর দরজায় পাহারা দেখে পেজেক যতটা ঘাবড়ে গিয়েছিলে চারপাশের পাহারা ততটা কড়া ছিলো না।

রাজপ্রাসাদের সামনের দরজায় জনা তিনেক পাহারাদার ছিলো। পেছনের দরজা পাহারাদার দুজন আর খসখসে গলা ওর সঙ্গীকে নিয়ে তাস খেলছিলো। ওরা জানে সদরজা দিয়ে বা বাইরের ফটক দিয়ে কেউ ঢুকতে বা বেরোতে পারবে না। চারপাশের দশ ফুট উঁচু পাচিলও টপকাতে পারবে না। শুধু ইহুদি শিরাককে বিশ্বাস নেই বলে ওর ঘরের দরজার বাইরে থেকে তালা আটকানো ছিলো। শীলারা ছিলো নিচে তলায়। ওপর তলার কনফারেন্স রুমে তখন মারাওস্কি আর কার্ল রেইনহাইম জার্মানীর দুজন ধনকুবেরের প্রতিনিধির সঙ্গে বসে দর কষাকষি করছিলো রাফায়েলের আঁকা আসল ম্যাডোনা নিয়ে। ছবির ব্যাপারটা মিটে গেলে বন্দী বিনিময়ের ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে ওদের। তখন পাহারাও অনেক বাড়াতে হবে। সরকার পক্ষের সব রকম হামলার জন্য তৈরি থাকতে হবে। কালই ওয়ারস থেকে নতুন ফোর্স আসবে।

পেজেক আর ক্রয়কা নিঃশব্দে স্পটিকে অনুসরণ করছিলো প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে শীলাদের খুঁজে বের করতে স্পটির বেশি সময় লাগলো না। শীলাকে দেখে স্পটি ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর কোলের ওপর। খুশিতে চিৎকার করে উঠতে যাচিছলো শীলা। পেজেক ইশারায় ওদের চুপ থাকতে বললো। তারপর টেলিভিশনের ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে নিচু গলায় বললো, গোটা এলাকা পুলিস ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু গ্রীন সিগন্যাল না পেলে আমরা বাইরে যাবো না।

একা ঘরের দরজাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো। জানালার কাছে দিয়ে পেজেক পুলিস চীফের দেয়া লম্বা টর্চটার আলো ফেললো আকাশে। তিনবার ওটা জ্বালালো আর নিভালো। তারপর জানালা বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলো । চরম মুহূর্তের জন্য।

আলোর সংকেত দেয়ার দুমিনিট পরেই রিনিরা শুনলো বাইরে মাইকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে-রাজপ্রাসাদের চারদিক ঘিরে ফেলা হয়েছে। ভেতরে যাবা আছো অস্ত্র ফেলে বেরিয়ে এসো। নইলে প্রত্যেকে মারা পড়বে।

ঘোষণার এক মিনিট পরই রিনিদের দরজায় প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিলো কেউ। পুরু মেহগিনি কাঠের দরজার এতটুকু আঁচড় লাগলো না তাতে। বাইরে থেকে মারাওস্কি চিৎকার করে বললো, দরজা খুলে বেরিয়ে এসো, নইলে গুলি করবো।

ঠিক তখনই বাইরে পরপর দুটো গুলির শব্দ হলো। মারাওস্কি ছুটে গেলো প্রাসাদের মূল দরজার দিকে। মিলিশিয়ারা বিশাল লরি থেকে মেশিনগান চালাতে চালাতে প্রচণ্ড গতিতে বাইরের ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকলো। পেছনের সুড়ঙ্গ দিয়ে আরো দশজন মিলিশিয়া ঢুকলো নিঃশব্দে সামনের দরজার দিকে। লরি আসতে দেখে প্রাসাদের ভেতরের প্রহরীরা সবাই সেদিকে গেছে। পেছন থেকে মিলিশিয়ারা এসে ওদের দিকে বন্দুক ঠেকানোর আগে পর্যন্ত টেরও পেলো না কি ঘটে গেলো। বাইরের ফটকের দুই প্রহরীকে আঁদ্রে একাই কাবু করেছে।

কার্ল রেইনহাইম মারাওস্কির মতো বোকামি করে নি। ছবি টবি ফেলে দুই জার্মান খদ্দেরকে নিয়ে ততক্ষণে সে গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে সীমান্তের দিকে।

গুণ্ডাদের সবার হাতে হাতকড়া পরানোর পর হাসিমুখে চীফ কমিশনার নিজেই অল কিয়ার হুইসেল বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ছুটে এলো শীলা, জনি, শোয়েব আর রিনি। শীলা জড়িয়ে ধরলো ওর বাবাকে। হাতকড়া পরা মারাওস্কি দাঁড়িয়েছিলো মাথা নিচু করে । জনি গিয়ে ওর টাকের ওপর জোরে চাটি মেরে বললো, মিস্টার রবার্ট মারাওস্কি, বলেছিলেন নেকড়ে দিয়ে খাওয়াবেন। আপনার নেকড়েগুলোকে অভুক্ত রাখতে হলো বলে আমি খুবই দুঃখিত।

শোয়েব অল্পক্ষণের জন্য বেরিয়ে গিয়ে জাঁ শিরাককে উদ্ধার করে আনলো। পরিচয় করিয়ে দিলো সবার সঙ্গে। পুলিসের চীফ অবাক হয়ে বললেন, আপনার কিছু হলে আমার যে চাকরি চলে যেতো!

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পেজেককে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, যায় নি এ ছেলেটার জন্য।

স্পটি এগিয়ে এসে পেজেকের গাল চেটে দিলো।

এতক্ষণ পর নিরাপদ ভেবে ত্রয়কার কাঁধের ওপর থেকে স্পটির পিঠে লাফ দিলো নিক।

একার সঙ্গে শীলাদের পরিচয় করিয়ে দিলো পেজেক। ত্রয়কা বললো, ক্র্যাকভে আমাদের মেলা না দেখে তোমরা কেউ যেতে পারবে না।

একগাল হেসে চীফ কমিশনার জাকোবস্কি বললেন, ক্র্যাকভের এই মেলা দারুণ দেখতে এক্সেলেন্সি। যদি সময় থাকে এ সুযোগ হারাবেন না।

জনিও বললো, রাজী হয়ে যাও মনু মামা।

রাষ্ট্রদূত হেসে বললেন, শীলার মাকে তাহলে আনার ব্যবস্থা করতে হয়।

জাকোস্কি বললেন, আমি এক্ষুণি ফোন করছি ওয়ারস আর ক্র্যাকভে। আজকের রাতটা আপনারা রাজপ্রাসাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। পেইন্টিং উদ্ধারের জন্য মনে হয় ছেলেমেয়েরা প্রেসিডেন্টের পদক পেতে যাচ্ছে।

কি মজা জনি ভাইয়া বলে খুশিতে শীলা জড়িয়ে ধরলো জনিকে।

পেজেকের চোখ দুটো আনন্দে চকচক করছিলো, দেশের এত দামী সম্পদ বক্ষার গজে সাহায্য করতে পেরেছে বলে।

রিনি আর শোয়েব সবার পেছনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিলো। দুজনের মুখে মৃদু হাসি ছিলো আর চোখে ছিলো অনেক না বলা কথা।